

গন্তব্য

সমরেশ বসু

বিশ্বাসি, অকালী। কলকাতা-১০

প্রথম প্রকাশ :

৩৬, ১৯৬১

প্রকাশক :

অসমিকশোর মণি

বিশ্বানী প্রকাশনী

৭৯/১বি, মহাআমা গাঁকু রোড

কলকাতা-৯

মুদ্রক :

অনাদিনাথ কুমার

উমাপক্ষ প্রেস

১২ গোরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট

কলকাতা-৮

প্রচ্ছদশিল্পী :

পূর্ণেন্দু পত্রী

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্তর্গত উপন্থাস :

চৈতি
অলিন্দ
কৃপায়ণ
জগদ্দল
ত্রিধাৰা
লগ্নপতি
অঙ্গুবিন্দু
অচিনপুতৰ
ত্রেষুধৰনি
বিষের আদ
অপরিচিত
নাটেৱ শুক
ছৱস্ত চড়াই
অলকা সংবাদ
বারো বিলাসিনী
মাসেৱ প্ৰথম রবিবাৰ
অক্ষকাৰ গভীৰ গভীৰতক
হারিয়ে থাওয়াৰ মেই স্বামা

সকালবেলা, সাতটা বাজতে সাত মিনিট বাকী। সরকারী পরিবহণের বাসটা দাঙিয়ে। পশ্চিমে, মনুমেন্ট, এখন শহীদ মিনার বলা হয়, যার ছায়া পশ্চিমের মাঠে, ঘাসে—ঘাস উঠে যাওয়া ধূলামাটি লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। চৌরঙ্গি সকালবেলার, এখনো তেমন ভি বহুল যানবাহনে সরব হয়ে উঠেনি। অধিকাংশ দোকানপাটের দ বক্ষ। শো-কেসের আলো নেভানো, এখন অঙ্ককার মতো, ঝলক দিচ্ছে না। বড় বড় হোটেলগুলোর সামনে ফাঁকা। সুরেন বাঁচুজ্জে চৌরঙ্গির মোড়ে, ট্রাফিক পুলিশ এখনো এসে তাদের জায়গা নেয়নি। গোয়ালারা বড় বড় সুরাটি ভাগলপুরী গাড়ীর গল্লার দড়ি ধরে, ঘটি বালতি নিয়ে চলাচল করছে।

কলকাতা, এখনো ঠিক কলকাতা হয়ে উঠেনি। উঠতে চলেছে। সকাল আটটার মধ্যেই, চেহারা বিলকুল পালটে যাবে। কোনো সন্দেহ নেই। দূরপাঞ্চার বাস যেখান থেকে ছাড়ে, তার চতুর থেকে দীঘাগামী বাস ছেড়ে গিয়েছে দশ মিনিট দেরিতে, ছ'টা দশে। আর একটা বাস, বেশির ভাগই যাত্রী বোঝাই হয়ে গিয়েছে। তাদের নানারকম কথাবার্তায়, বাসের ভেতর কলরবমুখর! ছাড়বে সাতটায়। একটা ট্যাকসি এসে দাঢ়ালো, ঝটপট দরজা খুলে, তড়ি ষড়ি চারজন নামলো। একজন চলিশের কম পুরুষ, স্বাস্থ্যবান, লম্বা লম্বা চুল মাথায়। ট্রাউজারের উপরে হাওয়াই শার্টের সোমশ বুক খোলা, ডান হাতে ষড়ি, দাঙি-না-কামানো মুখ। ব্যস্তভাবের মধ্যেও, খুশি আর উৎসাহী। হাতে একটা অ্যাটাচি। ট্যাকসি থেকে নেমেই, পিছনে

যেতে বললো, ‘অম্ব, তুমি ফুলরা আর বুবাইকে নিয়ে বাসে উঠে পড়ো, চোদ পনরো ষোল সতরো—এই চারটে সৌট আমাদের। আমি ট্যাকসি ভাড়া দিয়ে, স্মার্টকেশগুলো তোলবার ব্যবস্থা করে আসছি।’

অম্ব, ত্রিশের বেশি না, মাথার চুল খোলা, এখনো একটু ভেজা ভেজা, পিঠের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমান করে ছাঁটা। কপালে একটু সিঁহুর ছোঁয়ানো—ক্রত হাতে ছোঁয়ানো, বোঝা যায়। তার হাতে একটি রঙচঙে পাশবালিশের মতো ব্যাগ। অথবে বাসের দিকেই পাঞ্জিল, নির্দেশ মতো, যাত্রী ভরা বাসের দিকে, সাতটায় যেটা ছাড়বে।

খন আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকী,

চৈত্র মাস। আকাশ পরিষ্কার, রোদ ঝকঝকে সকাল। চৌরঙ্গির ওয়ায়, বড় বড় ইমারতের ছায়া এখনো পুর ঘেঁষে। পশ্চিমে সবুজের ঝলক। অম্ব হঠাতে খেমে বললো, ‘তুমি একলা তিনটে স্মার্টকেশ তুলবে নাকি?’

কণ্টকের দরজার কাছেই দাঢ়িয়েছিল, নেমে এলো। বললো, ‘কতো বড় স্মার্টকেশ, দেখি? শুপরে তুলতে হবে নাকি?’

ফুলরা—বছর পঁচিশ বয়স হতে পারে, অবিবাহিত। মাধাগ চুল অম্বুর থেকে আর একটু খাটো, কাঁধের একটু নিচে, খোলা। ভেজা ভাব নেই। ওর কাঁধে একটা চট্টের বিমুনি করা ব্যাগ ঝোলানো।

বললো, ‘দিদি, তুমি বুবাইকে নিয়ে গঠো, আমি কুমারদার সঙ্গে স্মার্টকেশ নিয়ে উঠছি।’

কুমার আবার বলে উঠলো, ‘চোদ পনরো ষোল সতরো।’

কণ্টকের ফুলরার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘আপনারা উঠে পড়ুন না, বাস ছাড়তে আর বেশি দেরি নেই। আপনারাই স্লাস্ট প্যাসেঞ্জার।’

কুমার বললো, ‘ইংয়া, উঠে পড়ো তোমরা, সাতটা বাজতে বেশি বাকী নেই।’

ট্যাকসি ড্রাইভার পিছনের কেরিয়ারের ঢাকনা খুললো। নিজের

ହାତେଇ ଚଟପଟି ତିନଟି ଚାମଡ଼ାର ସ୍ୱୟଟକେଶ ନାମଲୋ । ତିନଟିଇ ଚାମଡ଼ାର ସ୍ୱୟଟକେଶ ନା, ଏକଟା ପଲିଥିନେର, ଚେନ ଦିଯେ ମୁଖ ଆଟିକାନୋ । କଣ୍ଠର ବଳଲୋ, ‘ଏବ ଭେତରେଇ ଚଳେ ଯାବେ ।’

ମେ ଛଟୋ ସ୍ୱୟଟକେଶ ନିଯେ ଓପରେ ଉଠେ ଗେଲ । ତାର ପିଛନେ ପିଛନେ ଅମ୍ବ ଆର ଫୁଲରା ବୁବାଇକେ ନିଯେ ଉଠିଲୋ । କୁମାର ଟ୍ରାଉଜାରେର ହିପ୍ ପକେଟ ଥେକେ ପାର୍ସ ବେର କରତେ କରତେ, ଡ୍ରାଇଭାରକେ ବଳଲେ, ‘ମିଟାରଟା ଦେଖୁନ ତୋ ଭାଇ, କତୋ ଉଠେଛେ ।’

ବାସେର ଭିତରେ, ପାଂଚ ବଛରେର ବୁବାଇ, ଖୁଦେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆସନେର, ଜାନାଲାର ଧାରେରଟି ପ୍ରଥମେଇ ଦଖଲ କରେ ନିଯେ, ଖୁଦେ ଖୁଦେ ଦୀତେ, ମା ଆର ଶମୀର ଦିକେ ତାକିଯେ ହାସଲୋ । ଅମ୍ବ ବଳଲୋ, ‘ଫୁଲୁ, ତୁହି ବୁବାଇଯେର ପାଶେ ବୋସ, ତବୁ ଜାନାଲାର କିଛୁ କାହେ ହବେ ।’

ଫୁଲରା ନାକ କୋଚକାଲୋ, ଭୁରୁ କୋଚକାଲୋ, ବୁବାଇଯେର ମତୋ ହେଲା, ବାନ୍ଧୁସ ହୟେ ଉଠିଲୋ, ବଳଲୋ, ‘କେନ, ଆମାଦେର ଚାରଟେ ସୌଟେର ମଧ୍ୟେ, ଏକଟ ଯାତ୍ର ଜାନାଲା ପାଞ୍ଚଯା ଗେଛେ ?’

କୁମାର ପଲିଥିନେର ସ୍ୱୟଟକେଶଟା ଆର ଅୟାଟାଚି ନିଯେ ଏଗିଯେ ଏସେ ଲଲୋ, ‘ହ୍ୟୀ । ଏକଦିକେ ତିନଟେ, ଆର ଏକଦିକେ ଏକଟା । ତୁମି ତାମାର ଦିନି ଆର ବୁବାଇ ଏକଦିକେ ବସୋ, ଆମି ଚୌଦ୍ଦ ନସ୍ବରେ ବସଛି ।’

କଣ୍ଠର ସ୍ୱୟଟକେଶ ଛଟୋ ସଥାନନ୍ଦ ସେଥେ, ଏଗିଯେ ଏସେ କୁମାରକେ ଲଲ, ‘ଟିକେଟ ଗୁଲୋ ଦେଖାବେନ ଏକବାର ।’

କୁମାରେର ହାତେଇ ତଥନୋ ପାର୍ସ । ମେ ପାର୍ସ ଖୁଲେ, ଟିକେଟ ବେର କରେ ନଥାଲୋ । କଣ୍ଠର ହାତେ ନିଯେ ଟିକେଟ ଗୁଲୋ ଦେଖେ, ବୁକ ପକେଟ ଥେକେ ପଲିଲ ବର କରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିକେଟେ ଏକଟା କରେ ଦାଗ ଦିଯେ, ଆବାର ମାରେର ହାତେ ଫିରିଯେ ଦିଲ । ଫୁଲରା ତଥନ ବିରଙ୍ଗ ମୁଖେ ଗୋଟା ବାସଟାର ଡତରେ ଏଦିକେ ଓଦିକେ ଦେଖଛେ । ବିଶେଷ କରେ ଜାନାଲାଗୁଲୋର ଦିକେ । ବୁ ଟୌଟ ଛଟୋକେ ବିଶ୍ଵାସୀତି ବଳା ଯାଏ, ବ୍ରାତାବିକ ରଙ୍ଗ ଯଥେଷ୍ଟ ଉଞ୍ଜଳ । ବୁ, ଟୌଟେ ରଙ୍ଗ ବୁଲିଯେ ଏସେଛେ । ଡାଗର ଚୋଥ ହଟିତେ କାଲୋ ପେଞ୍ଜିଲାଗ । ନାହିଁ କୀର୍ତ୍ତି ଏଥନୋ ପାଉଡ଼ାର ଲେଗେ ଆହେ । ହାତକଟା ଝଲପାଇ ରଙ୍ଗ

কাঁচুলিকাট রাউজের সঙ্গে, শাড়িটাও মিলিয়ে পড়েছে, এমন কি
গলার আব কানের কাঁচগুলোও।

বাসের একদিকে তিনটি আসন পাশাপাশি, আব একদিকে ছুটি।
মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। পিছনে, একপাশে লোহার জালের
দেওয়ালের মধ্যে, বিবিধ বকমের ব্যাগ স্যুটকেশ। আব একপাশে
লেভেটরি। ফুলবাল নজরে পড়লো জানালার ধারে, একটি মাত্র
আসনই থালি। আব সেটা চেন্দুর পাশে তেরো। রৌতিমতো অন্যায়
আব অষোক্তিক, ফুলরার মনে হলো। বেজোড় সংখ্যার আসন কেন
জানালার ধারে পড়বে ? ওদিকে সতরো, এদিকে তেরো। বিরক্তিকর।
ও জেনে শুনেই, কগাঁটেরের দিকে তাকিয়ে জিজেম কবলো, ‘ওটা কত
নম্বর সৌট !’

প্রক্টির বললো, ‘নাম্বার থারটিন !’

| থেকে কেউ বলে উঠলো, ‘আনলার্ক নাম্বার !’ তাবপরে
হসি।

ফুলরা পিছন ফিরে তাকালো। পাশাপাশি তিন ঘুবক, একসঙ্গেই
যাচ্ছে বোধহয়। ওরা সবাই ফুলরাকেই দেখছে। ফুলরা মুখ ফিরিয়ে
নিল, তেরো নম্বর সৌটের দিকে তাকালো, সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে
কুমারের দিকে। কুমার কথন পলিথিনের স্যুটকেশটা সৌটের নিচে
রাখছে। অনু ডাকলো, ‘শোন ফুলু। বুঝাই না হয় একটু পরে উঠে
যাবে, তুই এখন এখানে এসে বোস না।

ফুলরা কিছু বলার আগেই কগাঁটের তার হাতের ঘড়ি দেখে বললো,
‘এই নাম্বার থারটিনই লেট করিয়ে দেবে দেখছি। সাতটা বাজলো,
এখন তুমি তেরো নম্বরেই বসো না। প্যাসেঞ্জার এলে, ছেড়ে দিও।’

সামনের চালকের আসনে ড্রাইভার উঠে বসলো, জোরে শব্দ করে
দরজা বন্ধ করলো। ঘেরা জালের ওপার থেকে, রোগা রোগা ড্রাইভার,

ভিতর দিকে তাকিয়ে, মোটা গমগমে স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘প্যাসেঞ্চার
সব এসে গেছে ?’

সামনের দরজা থেকে, বিশ বাইশ বছর বয়সের একটা ছেলে—
বোধহয়, সহিস বা ক্লিনার হবে, বললো, ‘তেরো নম্বর আসেনি !’

বঙ্গাট্টর বললো, ‘আমি আর পাঁচ মিনিট দেখবো, তারপরে ছেড়ে
দেবো !’

ফ্লান্টে বলতে সে পিছনের দরজার দিকে চলে গেল। ফুল্লরা তেরো
.স্বর সৌচে, জানালার ধারে বসলো, ওর পাশে চোদ্দ নম্বরে কুমার।
ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে, স্বর নামিয়ে বললো, ‘তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্চারকে
পটিয়ে-পাটিয়ে যদি চোদ্দয় বসতে রাজা করাতে পারো, তা হলেই
হলো !’

ফুল্লরা ডুর কোচকালো, ‘কন্ত ঠোটে হাসির আভাস, বললো,
‘পটানো আবাব কো ?’

কুমার এক চোখ বৃংজে, ইঙ্গত করলো। ফুল্লরা ঠোট ফুলিয়ে,
চোখেন তারা ঘূরিয়ে বললো, ‘অসভ্য আপান !’

কুমার বললো, ‘হ্যাঁ, আমি অসভ্য। পটানোটা তো আসলে
তোমাদেরই কাজ। একটু চোখ ঘূরিয়ে, ইয়ে করে, হাসি দিয়ে— !’

তাব কথার মাঝখানেই ফুল্লরা বালে উঠলো, ‘আর প্যাসেঞ্চারটি যদি
কোনো মেয়ে হয় ?’

কুমার যেন র্থাতিয়ে গেল, হঠাৎ কোনো জবাব মুখে এলো না। ফুল্লরা
খিলখিল করে হেসে উঠলো। পিছন থেকে শোনা গেল, ‘আনলাকি !’
উদ্বিষ্ট কে এবং উদ্বেশ্য, ফুল্লরা বুঝতে পারলো, মুখ ফেরালো না।
কুমারের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললো, ‘তখন আপনি পটাতে
পারবেন তো ?’

কুমার তৎক্ষণাত সপ্রতিভ হয়ে উঠলো, ‘মাথা খারাপ। বরং পাশে
বসে যাবে, সেটাই তো ভালো !’

ফুল্লরা ঠোট বাঁকিয়ে, গ্রাম্য ভঙ্গিতে বললো, ‘মুরোদ !’

রোগা ড্রাইভারের মোটা গমগমে স্বর শোনা গেল, ‘কী করবে ?
সাতটা পাঁচ হয়ে গেল !’ কঙ্কনির পিছনের দরজার কাছে দাঢ়িয়ে,
নিজের কবজির ঘড়ি দেখলো, ‘স্টার্ট করুন। এ তো আর প্রাইভেট
গাড়ি না, কারোব জন্য বসে থাকা যায় না !’

এশিন গর্জন করে উঠলো। গর্জন করতেই লাগলো, ছাড়লো না।
ফুল্লরার বুক চিপচিপ কবচে, আর জানালার বাইরে প্রতিটিলোকের
দিকে তাকাচ্ছে। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করতে আরস্ত করেছে।

এশিনের গর্জনের মধ্যে, ড্রাইভারের মোটা গলার চিংকাব শোনা
গেল, ‘কো হলো ?’

ফুল্লনা বলে উঠলো, ‘ছাড়ছে না কেন ?’

কঙ্কনির ঠং ঠং করে ঘন্টা বাড়িয়ে দিল। বাসটা তৎক্ষণাত ঝাকুনি
দিয়ে উঠলো। যেন টগবগে ঘোড়টা ছোটবাব জন্মই প্রস্তুত
হয়েছিল। ঝাকুনি দিয়েই, বাস টারমিনাসের সামানা থেকে রাস্তায়
চলে গেল।

কুমার বলে উঠলো, ‘ফুলু, তোমার ভাগ্যেরই জয় হলো, তেরো
নম্বর এলো না !’

ফুল্লরার দৃষ্টি তখনে বাইরের দিকে, বললো, ‘দাঢ়ান বাপু, আমার
এখনো বুক চিপচিপ করছে !’

গাড়ি বাঁ দিকে মোড় নিয়ে, এগোল, এবং তারপরে আবার বাঁ
দিকে। হাওয়ার একটা বাপটায়, ফুল্লরার কপালে চুল উড়ে পড়লো।
বুবাই ডেকে উঠলো, ‘ফুলু মাসৌ !’

ফুল্লরা বুবাইয়ের দিকে তাকালো। বুবাই হাসছে। অনুগ
হাসছে। কুমার হাসছে। বাস পুরী চলেছে।

এ সময়ে একটা ট্যাকসি বাসটাকে শুভারটেক করে, প্রায় বাসের
সামনে আস্তে আস্তে ব্রেক কবলো। ট্যাকসির ভিতর থেকে একটি
হাত বাইরে বেরিয়ে এলো। হাতে একটি বাসের টিকেট, চিংকার
শোনু গেল, ‘তেরো নম্বর। পিঙ্গ, এক মিনিট দাঢ়ান !’

বাস তখন দাঢ়িয়ে পড়ে গর্জাচ্ছে। কঙুষ্টির দরজা খুলে দিয়ে
বলে উঠলো, ‘কৌ যে করেন আপনারা। তাড়াতাড়ি আশুন।’

কুমার বললো, ‘মানে, তেরো নম্বরের প্যাসেঞ্জার?’

ফুল্লরার মুখের আলো নিষ্পত্তি হলো, বিরক্তির স্বরে বললো, ‘তা
ছাড়া আবার কৌ। ঠিক এসে গেছে।’ বলে ও শুরু করে উঠেগ
করলো। পিছন থেকে শোনা গেল, ‘আনলাইন।’ সমবেত হাসি।

কুমার বললো, ‘যাচ্ছা কেন, বসো না, দেখা যাক।’

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী তখন বাসে উঠেছে। ট্যাকসির
পথরোধ অপসারিত। বাস গর্জন করে, ইডেন আর আকাশবাণীর
মাঝখানের রাস্তা ধরে ছুটলো।

॥ হই ॥

তেরো নম্বর আসনের যাত্রী দরজার কাছে। বাস ডাইনে মোড় নিয়ে
ছুটেছে। আকাশবাণী ভবন পার, বাঁয়ে অ্যাসেম্বলি ভবন, ডাইনে
লাটিবাড়ির বাগান। কণ্ঠটির তেরো নম্বর যাত্রীর টিকিট দেখে,
সামনের দিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বললো, ‘সামনে এগিয়ে যান, বাঁয়ে
জানালার ধারে।’

কণ্ঠটিরের কথা যেন ছিটকে এসে লাগলো ফুল্লরার মুখে, রঙ গেল
বদলিয়ে, ভুঁঁ উঠলো বেঁকে, কাজল ঝাকা চোখের তারা কোণ থেকে
হাসলো একবার কুমারের দিকে, তারপরে তেরোর দিকে। তার
আগেই কণ্ঠটিরের কথা শুনে ওর মেজাজটা চড়ে উঠলো। ‘জানালার
ধারে।’ এতোটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে দেবার কী আছে? তেরো
কী অঙ্ক? যদিও তার চোখে আঁটা একটা ঢাউস ঠুলি, দুল্লরা ওর নিজের
হালকা আর স্বচ্ছ ঠুলির ভিতর থেকেই দেখতে পাচ্ছিল। তেরোর
ঠুলিটা একদম কালো, কিংবা বেগুনি হতে পারে, মোটের ওপর, তার
চোখ দেখবার কোনো উপায়ই নেই। এমন কি চোখের ছপাশও অস্বচ্ছ
গাঢ় কাঁচে ঢাকা। যেমন প্রেসিয়ার দেখতে গেলে লোকে ব্যবহার করে।
বাসের মধ্যে এরকম গ্লাস এটে গঠবার মানে কী? এখানে তো আর
রোদ ঝলকানো বরফ নেই। কিন্তু তেরো দরজার কাছেই থমকে দাঁড়িয়ে
পড়লো কেন? ভাবটা যেন গোটা গাড়ির ভিতরটা সে পুজাহুপুজ্ঞ
দেখে নিছে, প্রতিটি যাত্রীর মুখ যেন দেখছে। বিশেষ কারোকে খুঁজছে
নাকি? তা না হলে অন্ততঃ মুখোসধারীর মতো, চোখের ঠুলিটা
খুলুক!

এই রে ! ফুল্লরা মনে মনে চমকে উঠে, প্রায় জিভ কামড়াতে যাচ্ছিল। এর চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই, অস্ত্রায়ামীর মতো, তেরো চোখের টুলিটা খুলে ফেললো। গজিত গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোডে এসে পড়লো, ডাইনে মোড় নিয়ে ছুটলো হাওড়া বৌজের দিকে। এখানে ট্রাফিক পুলিশ ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। ভিড়ও চৌরঙ্গির তুলনায় বেশি। ষষ্ঠাবিক, বড়বাজার সামনেই, এবং ‘হাওড়া পুল’। রাস্তার ধারে উপচানো গঙ্গাব জলে, স্নান শৌচাদি চলেছে। গাড়ির গতি মন্তব্য। অনুমান করা যায়, সামনে অনেক গাড়ি। ধাসেব ইঞ্জিন যেন অদৈর্ঘ্য প্রাঞ্চিবাদে গর্জাচ্ছে।

মোটা ভুকব নিচে, তেরোর কালো চোখ তুটো বেশ বড়, কিন্তু দৃষ্টি যেন বাজপাথির মতো, তাক্ষ অনুসন্ধিৎসু। ডান ভুক্কর ওপবেই চুল এলিয়ে পড়েচ্ছে। এক মাথা রুক্ষ কালো চুল, মেয়েদেব বয়স্জ কাট চুলেব থেকেও অনেক বড়। গোটা মুখের আব ঘাড়ের পিছনে একটি চুলেব চালচিত্র, অ ব কালো গোফ দাঁড়। দাঁড়ব গুচ্ছ তেমন ঘন না, কিন্তু দেখে মনে হয় কাঁচি পড়েনি অনেকদিন, অবিশ্বাস, পাকানো। চুলে কোনো সিঁথির ব্যাপার নেই। ওপরের ঠোট অনেকখানি গোঁফে ঢাকা পড়েছে। নিচেব ঠোট পুরক্ষার দেখা যাচ্ছে, একটু টেপা, ঘেঁঁ শক্ত হয়ে আছে। দাঁড়ির নিচেই গলার কিছু অংশ, তারপরেই বুক খোলা, প্রায় চটেব মতো মোটা কাপড়ের, জামরঙের পাঞ্চাবি। বোতাম খোলা ফাঁকে স্বল্প রোমশ বুক দেখা যাচ্ছে। কাঁধে গোল লম্বা একটা ব্যাগ। সিষ্টেটিক কিছু, প্লাষ্টিক বা পলিথিন না, অন্য কিছু, সাদা আৱ লাল রঙ। কিন্তু পাঞ্চাবিৰ নিচে, নৌল ভিন কাপড়েৱ ট্রাউজার। এমন কি ফুল্লরা, তেরোৱ পায়েৱ রবাৱ সোলেৱ ফোমেৱ দাঁড় পাকানো স্বয়ং পদ্ধতি দেখতে পাচ্ছে। মনে মনে, ও বিজ্ঞপ কৱে হাসলো। বাঙালী হিপি নাকি ? বাঙালী তো বটেই। ফুল্লরাৰ মনে আছে, ট্যাকসি থেকে ভেসে আসা কথা, ‘তেরো নম্বৰ। প্লিজ, এক মিনিট দাড়ান !’...

ফুল্লরা ঝটিতি ডান দিকে কুমারের গায়ের দিকে ঝুঁকে একটা চাপ দিল। তেরো এগিয়ে আসছে। চোখে আবার, সামনে পাশে ঢাকা ঠুলিটা এঁটেছে। গাড়ি হাওড়া ব্রীজের মুখে, গর্জন শুনলে মনে হয়, অকাণ্ড ঘোড়াটা পা দাপাছে, মুখ দিয়ে ফেনা ছিটকে বেরোছে।

কুমার নিচু স্বরে বললো, ‘কৌ হলো, টেলছো কেন?’

‘তেরো নম্বর আসছে, সরুন, উঠে পড়ি।’ ফুল্লরা বললো।

পিছন থেকে শোনা গেল, ‘স্মে আসিলো।’ হাসি, এবং তারপরেই আর একটি স্বর, ‘আনলাক।’ সমবেত টলে পড়া হাসি।

কুমার বললো, ‘বনো না, এতো নার্ভাস হচ্ছো কেন। আসতে দাও দোখ কি করে।’

তেরো এগিয়ে আসছে, ধীবে, প্রত্যেকটি আসন এবং যাত্রীকে দেখতে দেখতে, সীটের পিছন ধরে, শরীরের ভারসাম্য রেখে। গাড়ি ব্রীজের ওপর। ফুল্লরার গঙ্গা দেখা হচ্ছে না। বাতাসে চোখে মুখে চুল উড়ে পড়ছে, যদিও সামনের দিকে কিছু চুল ছোট করে কাটা আছে।

‘ফুলু মাসা, গঙ্গা।’ বুবাইয়ের চৌকার শোনা গেল।

কে যেন বলে উঠলো, ‘জয় মা গঙ্গা।’

বিদ্রূপপূর্ণ স্বর, ‘ভালোয় ভালোয় পৌছে দিস মা।’ সমবেত হাসি।

কুমার নিচু স্বরে বললো, ‘তেরো নম্বর মেয়ে নয়, এখন তোমারই রেসপন্সিবিলিটি।’

‘কিসের রেসপন্সিবিলিটি?’ ফুল্লরা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ওর দৃষ্টি তেরো নম্বরের এগিয়ে আসা জুতোর দিকে। এই সামান্য ব্যাপারেই, ফুল্লরার বুক টিপচিপ করছে, বাতাসের ঝাপটা সত্ত্বেও মুখে ঘাম জমছে।

কুমার বললো, ‘ইয়েৱ—মানে, এমন একটা দারুন হাসি আর লুক দেবে, আৱ—।’ ।

‘থামুন।’ ফুল্লরা কুমারের কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, ‘ও
মেয়ে হবে কেন? দেখছেন না, যে ভাবে সবাইকে দেখছে, নিশ্চয়ই
ওর কোনো বাস্তবীর থাকার কথা ছিল। বেচাবি! এসে নেল, উঠ! ’

কুমার শাস্তি ভাবে বললো, ‘আরে বসো না, আমি ম্যানেজ করছি।
ওর বাস্তবী আসেনি তো কী হয়েছে, আর একটা বাস্তবী পেবে যাব।
আমি ম্যানেজ করছি। ’

‘কুমারদা।’ ফুল্লরা নিচু ধরকেব স্বারে বলে উঠলো।

কিন্তু আর কিছু বলাব সময় নেই, কেবো একেবাবে কুমারের
সামনে। গাড়ি গঙ্গা পার, রেল ব্রীজের দিকে এগোবাব জন্য গর্জাচ্ছে।
হাঙড়া স্টেশনের সামনে থিকথিকে। শুড়। মাঝুয এবং সবলকমের
যানবাহনের। বাস লাই ট্রাম টেক্সেপা ঘোড়ার গাড়ি আইভেট আর
টাকসি আব রিকশাও। ট্রাফিক পুলিশ ঘন্টের মতো নিবিকার।
হাত এদিকে দেখাচ্ছে, ওদিকে দেখাচ্ছে। কে কাব ঘাড়ে পড়ছ, তা
আর দেখবাব নেই, কেবল নাস্তারটা টুকে বাখা। নাস্ত বেগতিক
দেখলে, বেদৌ থেকে অবতরণ করতে হয়।

কুমার উঠে দাঢ়ালো, তেরো নস্বরকে চোদ্দ নস্বর খাসন দেখিয়ে
বললো, ‘বসুন।’

বলে সরে গিয়ে পনরো নস্বর সৌট ধরে দাঢ়ালো। ফুল্লরা দেখলো,
তেরো তৎক্ষণাত বসলো না, সৌটের গায়ে নস্বর দেখছে। ফুল্লরার পক্ষে
অতঃপৰ বসে থাকা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি ওঠবার উচ্চোগ
করে বললো, ‘এটা তেরো নস্বর।’

‘আহা-হা তুমি বসো না ফুলু।’ কুমার বলে উঠলো, এবং তেরোকে
চোদ্দ নস্বর সিট দেখিয়ে জিজেস করলো, ‘এখানে বসলে আপনার
অস্মুবিধা হবে?’

তেরোকে চোখের ঠুলির জন্য ছান্দবেশী মনে হচ্ছে। এবং তার
স্বরের বিশ্বয়ের সঙ্গে, মুখের অভিব্যক্তির কোনো মিল দেখা গেল না,
‘অস্মুবিধা কেন?’ ঠুলির ওপর দিয়ে, কপালে একটা রেখা পড়তে

দেখা গেল, বোধহয় ভুক্ত কোচকালো, এবং তারপরে ঝকমকে সাদা দাঁতে একটি হাসলো, বললো, ‘এটা চোদ্দ নম্বর বলে ? অনুবিধা হবে কেন ?’

তেরো নম্বর ঘাড় থেকে ব্যাগটা নামিয়ে হাতে নিল। কুমার এবং অনু আর বুবাইয়ের দিকে একবার দেখলো। কুমারের মতো, অনু তখন বুবাই তেরোকে দেখছিল। তেরো চোদ্দ নম্বর আসনে বসলো। ফুলবা লজ্জা আর অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হয়ে গেল। ও জানালার দিকে অনেকটা ঝুঁকে গেল, এবং মাথাটা পিছনে হেলিয়ে কুমারের দিকে তাকিয়ে বললো, ‘কুমারদা আমি শুধানে যাচ্ছি, আপনিই বরং এদিকে আসুন !’

কুমার ভুক্ত কুচকে, খানিকটা অবাক হবার মতো করে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেন ?’ বলে আবার অনুর দিকে তাকালো, এবং সেদিক থেকে তেরোর দিকে।

ফুলরার দৃষ্টিশ অনুর দিকে, উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হলো। ফুলরার মুখে রঙের ছটা—লালচে।

তেরো তাকালো একবার কুমারের দিকে, তারপরে ফুলরার দিকে। এবং একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বললো, ‘আমাৰ কোনো অনুবিধি হচ্ছে না !’

ফুলরাব মুখের রঙ আর একটু গাঢ় হলো, ও তাকালো কুমারের দিকে। কুমার ঘাড় ঝুঁকিয়ে ঠোটের কোণে একটু হাসলো, এবং অনুর দিকে ফিরে তাকালো। অনু হাসলো, তাকালো ফুলরার দিকে। হাতের এবং ঘাড়ের ভঙ্গিতে ফুলরাকে বসতে বললো। বুবাই ওৱ সমস্ত দাতগুলো দেখিয়ে, এমন খুশিতে হেসে উঠলো, চোখ ছটো ঢাকা পড়ে গেল। ফুলরা বঁা দিকে, জানালার কাছে ঝুঁকে, যতোটা সন্তুষ সরে বসবার চেষ্টা করে, বাইরের দিকে তাকালো। কিন্তু কিছুই দেখছে না।

‘কপালে অনেক দুঃখ আছে, সেই আনলাকি নাস্তাৰ !’

পিছন থেকে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি হঠাত থমকে গেল,
কারণ থমকের শব্দ শোনা গেল, ‘কী হচ্ছে কো !’

‘তুই চুপ কর, যা করছিস, তাই কর !’

অন্য স্বরে শোনা গেল, এবং সমবেত হাসি এবং নিশ্চিত চলাচলি,
হাসি শুনলেই বোঝা যায়, ফুল্লরাব মনে হলো। ওর দৃষ্টি বাইরের
দিকে। কিছুই দেখছে না, সবই অর্থহীন ছবির মধ্যে চোখের শুপর
দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। গাড়িটা চলছে গর্জন করে, যেন সবকিছু চুরমার
করে দেবে। ফুল্লরাব মুখে রঙ খেলা করছে। ‘অসভ্য !’ মনে মনে
বলছে। অকুটি করছে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করছে।
কুমারদা কি এখনো হাসছেন ? আর দিদি ? আর বুবাইটা ? কী
বিছিরি কবে হাসাছল বুবাইটা ! তি ছি ! ফুল্লরাব মন গাড়ির
ভিতরে।

হঠাতে তাঙ্গ আর্তনাদ করে গাড়িটা ব্রেক কবলো, যাত্রীরা সব ঝট-
ঝাঁকুনিতে বেসামাল হলো। পিছন থেকে কগুল্টিরের চিংকার শোনা
গেল, ‘এই, এই, কেয়া হোতা হ্যায় ? রাস্তা মে দিল্লাগি হোতা হ্যায় ?’
বলেই সামনের দরজার বিশ বাইশ বছর বয়সের ছেলেটাকে চিংকার
করে ডাকলো, ‘সে সুদরশনো !’

সামনের দরজার ছেলেটা আওয়াজ দিল, ‘হ’ !

কগুল্টির ওড়িয়া ভাষায় কিছু বললো, যা ফুল্লরা বুঝতে পারলো
না, কেবল ‘প্রায়ভ্যাট’ শব্দটি ছাড়া। ইতিমধ্যে ধূলা উড়ে এসেছে,
স্পষ্টতঃই, এধূলায় হাওড়ার গন্ধ, এবং দৃশ্য। অতি পরিচিত হাওড়ার
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ছোট রাস্তা, উপহানো মানুষ রাস্তার দু'পাশ জুড়ে গাড়ি,
দোকানের সারি, নর্দমার ধারে নগ শিশুদের মলমৃত্ত ত্যাগ, এবং পথ-
চারীরা খুবই নির্বিকার আর মন্ত্র, ফুল্লরা এখন বাইরের দৃশ্য দেখছে।
পিছনের কগুল্টিরের কথা শেষ হতেই সামনের দরজা খুলে, সুদর্শন ঘার
নাম সে নামতে যাচ্ছিল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করলো। তৎক্ষণাত
ফুল্লরাব নাসারঙ্গ ফুলে উঠলো, তুরু কুচকে উঠলো এবং মুখটা

জানালার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ সরিয়ে এনে নত চোখের পাতায়, কোণ দিয়ে তাকালো ! তেরো নম্বর তার ব্যাগের মধ্যে হাত গলিয়ে ঝুঁকে পড়ে কিছু খুঁজছে। গঙ্কটা গাড়ির ভিতর থেকেই নাকে এসেছে, অবিশ্বিত হু এক বলক, কিন্তু স্পষ্টতঃই রাম-এর। ফুল্লরা গঙ্কটা চেনে, বিশেষ করে রাম-এর গন্ধ। বরং হইশ্বি বা অন্ত কোনো মদের গন্ধ ঠিক চিনতে পারে না। বৌয়রটা একটু পারে। কুমার মাঝে মাঝে রাম পান করে। হইশ্বিই বেশি, দিনের বেলা কোনো কোনো দিন বৌয়র। তবে খুব কম। দিনের বেলা! ড্রিংকের পাটি বিশেষ থাকে না, ছুটির দিন কখনো সখনো। বাত্রিব দিকে আয়ই—রোজ না হলেও, প্রায় রোজ। বিশেষ বিশেষ কেত্রে, শুর বা দিদি অনুর যে কোনো পানীয়ের স্বাদ গ্রহণ করা হয়নি, তা না। অর্বাশি সেই সব দানে, কুমারের বন্ধুদের সঙ্গে, তাদের পত্নীরাও থাকে, এবং সব মেয়েদেরই কিছু কিঞ্চিৎ মিয়ম-ভঙ্গ, ঘটে। কুমারের কোনো কোনো বন্ধু পত্নীর নিয়মভঙ্গটা, যাকে বলে, ‘সত্য হাই !’

কিন্তু বাসের মধ্যে কে বা কারা, এতো লোকজনের মধ্যে এই সাত সকালে পান শুরু করেছে ? ফুল্লরার জিজ্ঞাসু মন, নত চোখের কৌতুহলিত দৃষ্টি, তেরোর ব্যাগ হাতড়ানোর দিকে। ব্যাগটার ভিতর থেকে গঙ্কটা এলো নাকি ? তেরো তার লম্বা ব্যাগের অনেক ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। এবং একটা কিছু টেনে তুলতে গিয়ে, ব্যাগ থেকে ঘেটা বাইরে পড়ে গেল, সেটা একটা বই। ইংরাজী পকেট বই, ফ্রান্জ কাফকার ষেটামরফোসিস অ্যাণ্ড আদাৰ স্টোরিজ। তারপরেই তেরোর হাতে উঠে এলো, কোয়ার্টার পাউণ্ডের একটা পাউরফট। সে ব্যাগের মুখে, ডোরাকটা কোনো জামা ঢাকা দিয়ে, হু-ইচ্চির মাঝখানে চেপে, বইটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

ফুল্লরা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো। বাইরের কিছুই দেখছে না। তেরোর ব্যাগে যদি রাম থাকতো, তাহলে আবার গন্ধ পাওয়া যেতো। কিন্তু ছেলেটা—ফুল্লরার ভাবনা ধূমকালো। এবং

হঠাৎ-ই ও একবার ডান দিকে ফিরে, তেরোর দিকে তাকালো, মনে মনে ভাবলো ঠিকই ভেবেছে। লোকটা না ছেলেটাই, যতোই গৌক দাঢ়ির জঙ্গল গজাক আর, মাথা ভরতি চুলের গোছা। চুলগুলোর দিকে দেখলেই অস্থস্তি লাগে, এতো ঘন আর বড়। উকুন নেই তো? কিন্তু, ফুলরা যা ভাবছিল, ছেলেটা কী এখন পাঁউক্কটিটা খাবে নাকি? ও তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েই চোখ পড়ল কুমারের ওপর। কুমার ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে, এবং ফুলরার দিকেই তাকিয়ে দেখছে। ওব চোখের স্বচ্ছ প্রান্মের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় মাত্রেই, কুমার অস্তুর দিকে ফিরলো। অনুও তাকালো, ঠোঁটে চাপা কৌতুকের হাসি।

ফুলরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিল, ওর মুখে বঙের ছুটা লাগছে। হঠাৎ গর্জিত বাস্টা আবাব তৌক্ষ আর্তনাদের শব্দে দাঢ়িয়ে পড়লো, চলন্ত এঞ্জিনের ঝংকারে কাপতে লাগলো। আর তৎক্ষণাত ওব কোলের ওপর কিছু পড়লো। ফুলরা চমকে তাকিয়ে দেখলো, মেটামুক্ফোসিস এ্যাণ্ড আদাব স্টেরিজ, আবছা সবুজ রঙের সেই বিদ্যুটে ছবির মলাট। তেরো বলে উঠলো। ‘সবি! ’ এবং ফুলরার কোলের ওপর হাত বাঢ়াতে গেল। তার এক হাতে কাগজের মোড়ক খোলা পাঁউক্কট।

ফুলরার নাসারন্ধ্র আবাব ফীত হলো, আবাব সেই এক বলক গন্ধ! ও তাড়াতাড়ি বইটা তুলে, তুজনের মাঝখানের হাতলের ওপর এগিয়ে দিল। পিছন থেকে চলচলে মোটা স্বর শোনা গেল, ‘এখন আমি গান করব! ’

আর একজনের স্বর, ‘কিন্তু সেই গানটা যেন গাসনে! ’

তারপরেই নিচুম্বরে ফিসফাস, এবং সমবেত হাসি, এবং তার মধ্যেই উচ্চারিত হয়, ‘এবার দেবে! ’ তৎক্ষণাত ছলোড়ে হাসি।

তেবো গৌক দাঢ়ির মধ্যে পাঁউক্কট চেপে ধরলো। ফুলরার গাটা কেমন ঘুলিয়ে উঠলো।

প্রথমতঃ গৌকদাঢ়ির মাঝখানে, হা-মুখে যেভাবে ঝটিটা তেরো নম্বর কামড়ে ধরলো, দৃশ্যতঃ সেটা বিদ্যুটে। ওর ওপর-পাটির দ্বাতন্ত্রলো,

ପଲକେର ଜନ୍ମ ଏକବାର ଶାନିଯେ ଉଠିଲୋ, ତାରପରେଇ ଏକରାଶ ସନ କାଳେ
ଗୋଫ ଦାଡ଼ିର ମଧ୍ୟେ ନରମ ଝଟିଟାକେ ଦେଖାଲୋ ଯେନ ହିଂସର ପ୍ରାସେର କର୍ତ୍ତମ
ଶିକ୍ଷାର । ବୁଲ୍ଲରାର, କେମନ ଯେନ ଗା ସୁଲିଯେ ଓଠାର ଏଟା ଏକଟା କାରଣ ।
ତା ଛାଡ଼ା ଏରକମ କାଚା ପାଉରଟିଓ ମୋଟେ ଥେତେ ପାରେ ନା, ଓର ଗା
ସୁଲାଯ । ମିଷ୍ଟି କିନମିସ ଦେଓଯା ବନ୍ଦରଟି ଯଦି, ବା ଖାଓଯା ଯାଯ, କାଚା
ପାଉରଟି, ତାଓ ମାଥନ ବା ଜେଲି ଛାଡ଼ା, ଅସମ୍ଭବ ।

॥ তিনি ॥

গাড়িটা গর্জাচ্ছে, এখনো দাঢ়িয়ে, কাপছে। ঠিক যেন রাগে কাপছে। সামনে রেলওয়ে সাইডিং, লেবেল ফ্রিসিংয়ের গেট বঙ্ক। ফুল্লরার বাঁ গালে বোদ। কিন্তু মাথন বা জেলির কথা, নিশ্চয়ই, তেরোর ভাববার অবকাশই নেই। খাওয়ার ভঙ্গিটা অতি ক্ষুধার্ত, বেশ ড্রুত। দেখলেই বোৰা যায়, ছেলেটা—ছেলেটা? হাঁ, ছেলেটাই তো! ফুল্লরা সেটা আগেই বুঝে নিয়েছে, তেরো একটা ছেলেই। শুর বয়সী হতে পারে—পঁচিশ। কিংবা আরো কম। মেয়েরা চোখে দেখে বয়স ধৰতে পারে। ছেলেদের সে-চোখ নেই, অন্ত চোখ আছে। ছেলেটা পাউরুটি খেতে এতোই মগ্ন, ফুল্লরা বুঝতে পারছে, স্থান কাল সম্পর্কে ওর বিন্দুমাত্র চেতনা নেই। রাম-এর গন্ধটা, ফুল্লরা এখন ধরতে পারলো, গাড়িটা দাঢ়ালেই নাকে এমে লাগছে। তাৰ মানে কী? গাড়িটা দাঢ়িয়ে পড়লেই, পিছনের বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে? কাঁচা পাউরুটি থেকেও, প্রায় এই জাতীয় গন্ধ আসতে পারে কিন্তু সেটা হতো অত্যন্ত হালকা। এৱেকম নির্ধারণ রাম-এর না। তবে গন্ধটা, প্রথমে পাওয়া গিয়েছিল যখন, তেরো তখন ব্যাগের মধ্যে হাত দিয়েছিল। তা হোক, রাম-এর সঙ্গে তেরোৰ কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে গন্ধটা অনেক বেশি তৌৰ লাগতো। তা লাগছে না।

গেটের এপারে ওপারে, ইঞ্জিনগুলোৱ গৰ্জন, হৰ্নেৰ চিংকাৰ হঠাৎ বেড়ে উঠলো। গেট খুলেছে। এটাকেই বোঁধ হয় শালিমারেৰ গেট বলে। তেরোৰ পাউরুটি শেষ। কাগজেৰ মোড়কটা সে দলা পাকিয়ে

হাত বাড়িয়ে জানালার বাইরে ফেলে দিজ। একরম করে মাঝুষ কথন থায়, কেন খায়, ফুলরা কিছু কিছু জানে। সময় নেই, উপায় নেই। অত্যধিক ব্যস্ততা, এবং স্বভাবও কোনো কোনো সময় এর কারণ। এরকম স্বভাব ছিল বিমানের, ফুলরাদের সঙ্গে উনিভারসিটিতে পড়তো। বিমান কবি। তেরোঁর মতো না হলেও বিমান প্রায়ই গোফ দাঢ়ি কামাতো না। চুল ছাঁটতো না, পোশাক-আসাক ছিল অগোছালো। কেন, জিজ্ঞেস করলে একটু অবহেলার হাসি হাসত। এসবের কী গুরুত্ব আছে, এরকম একটা ভাব। কেন? গুরুত্ব থাকবে না-ই বা কেন? ভড়ং। বিমানের চুল গোফ দাঢ়ি, অগোছালো পোশাক আর কবিতা, সব কিছুকেই ভড়ং বলে মনে হতো। চমক। অতিরিক্ত শ্বার্টনেসের সঙ্গে, কবিতায় কিছু ভাল্গার কথাবার্তার বাবহার। তার সঙ্গে রেতুলিউশন। অন্ততঃ চারজন জনপ্রিয় কবির জগাখিচুড়ি মিশেল। ফুলরা অনেকদিন বিমানকে বলেছে, ‘এখন যে-রকম ভাবে কথা বলছো, ঠিক এইরকম কথার মতো কবিতা লিখতে পারো না?’ কারণ, বিমানের প্রেমের ভাষা ছিল বেশ ঘুরবকে, একটা গভীরতার স্পর্শগ্র থাকতো। নিবেদনের থেকে প্রার্থনার আকৃতি, আর হৃদয়ের অনুভূতির সরল প্রকাশ, অকপট ছিল প্রাণের গ্রানিট ভাষা। শুনলে, নিরালায় শুর গা ঘেঁষে বসতে ইচ্ছা করতো। আড়ালে, শুর মুখ, বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করতো না। ও তা বুঝতো না। ভডং করেই গেল। আর ভডং, তা সে যে কোনো ব্যাপারেই হোক, সব কিছুর কাল। বাড়ি থেকে খেয়ে না-আসা দোকান থেকে বঢ়ি কিনে খাওয়া - কুক্টি কেন, অনেক কিছুই, চলতে চলতে, কথা বলতে বলতে খাওয়া, এক ধরনের স্বভাবজাত। কী প্রমাণ করার চেষ্টা থাকে এ সবের মধ্যে? সঙ্গল পরিবারের ছেলে, অর্থভাব নেই, সময়ভাব নেই, নিজের পড়া-শুনা ছাড়া কোনো দায়িত্ব নেই—কবিতা সেখা আর প্রেম করা বাদ দিলে। কিন্তু তার জন্ম বাটিগুলে হবার কোনো দরকার ছিল না। কে বোঝাবে শুকে সে-কথা? ফুলরা সেই বোঝাবার পরিশ্রম করতে চায়

নি। সে-পরিশ্রমের একটাই অর্থ। একটাই তার উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে-অর্থ আর উদ্দেশ্য, ফুল্লরার ছিল না। ফুল্লরা বুঝতে পেরেছিল, বিমানকে সাময়িক ভাবে ভালো লাগাটা, বিমানের অদর্শনেও সারাদিন মনকে আচ্ছাদ করে রাখতো না। অনেক মুখ ওকে অন্যমনস্ক করতো। কেউ কেউ, বেশ কিছুদিন ওর মনকে বগলদাবা করে রাখতো। এরকম অবস্থায়, বিমানকে বোঝাবার পরিশ্রম করার কথাই আসে না।

পাঁচিলের ধারের বড় বড় গাছের ছায়া পেরিয়ে, খানিকটা গিয়েই গাড়ি একটু ডাইনে ঘূরলো। রোদ সরে গেল ফুল্লরার মুখের বীঁ দিক থেকে। শহর হাওড়ার সেই গক্ষ, ঠাসাঠাসি ভিড় এখন আর নেই। দৃশ্য গ্রামীণ হয়ে উঠছে, এবং গাড়ির কুকু গর্জন আর তেমন তৌর বোধ হচ্ছে না। আকাশ বড় হয়ে যাচ্ছে, মাঠ তাকে ছুঁই ছুঁই করছে, গাছপালার ভিড় বাড়ছে, আর এ সবই যেন গাড়ির গর্জনকে অনেকটা শান্ত প্রশংসিত করছে।

মেটারবকোসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ, গাড়ি মোড় নেবার সময়েই আবার ফুল্লরার ডান দিকের কোলের কাছে পড়লো। ফুল্লরা তেরোর দিকে তাকালো। তেরো তার ভানপাশে তাকিয়ে, কুমারদাদের দিকে। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টিবিনিময় হলো। তার হাতে একটা ইংরেজি পত্রিকা, সে টেক্ট টিপে হাসলো। জিজ্ঞেস করলো, ‘ফুলু, কিছু খাবে?’

ফুল্লরা অবাক ক্রকুটি করে কিছু বলতে গিয়েও, বলতে পারলো না। সেই রঙের ছটা, আবার লাগলো মুখে, মনে মনে বললো, ‘কী অসভ্য!’ কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে বললো, ‘না।’

তেরো বাঁকড়া চুল মাথাটা ওর দিকে ফেরালো। তার চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মুখের মধ্যে কিছু একটা চুষছে মনে হয়। চোয়ালের দাঢ়ি সেই রকম নড়ছে। ফুল্লরা মুখটা ফিরিয়ে নেবার আগেই, বুবাই বলে উঠলো, ‘হ্যা, খাও না ফুল্মাদী। তুমি একটা পেষ্টি খাও, আমিও একটা খাই।’

বুবাইটাৰ সেই ছোট ছোট দ্বাতে ছুঁটু আৱ আবদারেৰ হাসি। মন্দে
হলো, ছেলেটা ও বাবাৰ মতো, ফুল্লৱাৰ পিছনে লাগছে। অনু ততোক্ষণে,
নিচু হয়ে, ছোট একটা ব্যাগ তুলে নিয়েছে। ওই ব্যাগেৰ মধ্যেই কিছু
শুকনো খাবাৰ আছে। কিছু প্যাকেটে, কিছু একটা টিফিন বক্স-এ।
ফুল্লৱা বুবাইকে বললো, ‘আমাৰ খেতে ইচ্ছে নেই, তুমি খাও।’ বলে
জুকুটি চোখে কুমাৰেৰ দিকে দেখলো। তেৱে তখন আবাৰ মুখ
ফিরিয়ে, বোধ হয় বুবাইকে দেখছে বা তাৰ ডান দিকে আৱ কাৰোকে,
বা জানালা দিয়ে বাইৱে।

কুমাৰ বললো, ‘খাও না ফুলু। মিষ্টি ইচ্ছে না কৱে, নোন্তঃ
একটা কিছু খাও। সেই তো কোন্ ভোবে তাড়াছড়োতে একটু চা
বিস্কুট খেয়ে বেৰিয়েছো।’

ফুল্লৱাৰ ভুৱঙ্গতে যতো ধূলুকেৰ টংকাৰ, রঞ্জেৰ ছট্টাৰ ততো বেশি
লাগছে। তেৱে আবাৰ শুৱ দিকে তাকালো। আশৰ্চৰ্য, ছেলেটা কি
ফুল্লৱাদেৰ কথাবাৰ্তা শুনছে, আৱ তাকয়ে দেখছে নাকি? হঠাৎ একটা
মিষ্টি গুৰি শুৱ নাকে এলো, অনেকটা টফি বা চকোলেট জাতীয়।
ফুল্লৱা জানে, কুমাৰেৰ হাসিটা মোটেই সৱল না, এবং খাবাৰ
অনুরোধটি ও নিতান্ত তা না। মোটা ভুৱণ নিচে, কালো বকৰকে চোখ
ছটোৱ দৃষ্টি আৱ টেপা টেপোৰ হাসি শুৱ ভাসোই চেনা আছে।
বললো, ‘আপনিই খান, আপনাৰ খিদে পেয়েছে।’

কুমাৰেৰ মুখ কিছুটা ওৱ বায়ে, এদিকেই ঝৌকানো। বললো,
‘তুমি খেলে আমিও খেতাম।’

একটি রামচিমটি অথবা পিঠে একটি কিল মাৱা ছাড়া, এ-মুহূৰ্তে
একথাৰ কোনো জবাব হয় না। কিন্তু আপাততঃ তা সন্তুষ্ট না। আৱ
আশৰ্চৰ্য, তেৱে আবাৰ ডান দিকে ফিরে তাকালো।

অনু বলে উঠলো, ‘তা হলে খা ফুলু। একটা চিকেন প্যাটিজ
নিবি?’

দিদিৰ হাত থেকে তখন বুবাই রঞ্জীন কাগজে মোড়া পেষ্টি

নিচ্ছে। বুবাই ফুল্লুরার দিকে তাকিয়ে, ঘাড় দোলালো, চোখের তারা
ঘোরালো, বললো, ‘থাবে ?’

দিদির হাসিতে আপাতৎঃ কোনো চাহুরি নেই। তা হলে, ফুল্লুরার
মনে হতো, ওরা সপরিবারে ওর পিছনে লেগেছে। অস্তুত ব্যাপার।
তেরো ওৰ দিকে মুখ ফেরালো। ফুল্লুরা মুখটা একটু পোছয়ে নিয়ে,
অজুকে বললো, ‘আগেই ভো কথা হয়েছিল, ফাস্ট’ স্টপেজে গিয়ে
থাবো। তুমি ভুলে গেলে ?’

অন্ত বললো, ‘তা বলেছিলি। ঠিক আছে।’ কুমারেব দিকে তাকিয়ে
বললো, ‘তুমি নেবে নাকি কিছু ?’

কুমার বললো, ‘থাক।’ বলে ফুল্লুরার দিকে তাকালো। ঠোটে
সেই হাঁস।//

ফুল্লুরা বায়ে, তামালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিস। রেটোমরহোসিস
অ্যাণ্ড... ওর ডান দিকে কোলেব কাছে পড়ে আছে। ওর খেয়াল ঠিক
আছে, কিষ্ট বইটা ও আগের মতো হাতে করে তুলে দিল না। কেন
দেবে ? বইটা বারে বারে পড়বে, বাবে বাবে, ও তুলে দেবে নাকি ?
ছেলেটার খেয়াল মেই কেন ? কিংবা খেয়াল আছে তবু তুলছে না ?
ফুল্লুরা তুলে দেবে বলে ? অবিশ্বি এর আগে, ছেলেটা নিঙ্গেই হাত
বাড়িয়ে, ওর কোল থেকে তুলে নিতে উচ্চত হয়েছিল। ফুল্লুরার তখন
মেয়েলি অস্বস্তি বা শালীনতায় বেধেছিল, স্পর্শ-বিস্তা যাকে বলে।
তেরো এখন ওকে স্পর্শ না করেই বইটা তুলে নিতে পারে। কিন্তু
ছেলেটা কেমন ? বোকা নাকি। ওরকম করে দেখছিল কেন ? ঘেন
হঠাৎ ফুল্লুরাদের বিষয়ে খুব সচেতন হয়ে উঠেছে !

‘আচ্ছা, ফাস্ট’ স্টপেজটা কোথায় ?’

ইতিমধ্যেই আবার আকাশটা ছোট হয়ে আস্বার্ছিল, ঘিঞ্জি রাস্তা
বাড়ি ঘর আৱ ভিড়ের আড়ালো। গাড়িৰ গঞ্জনও তুক্ক শোনাচ্ছিল।
ফুল্লুরার চুলেৰ বাপটা লাগা মুখে অকুটি-জিজ্ঞেস জাগলো ? স্বরটা যেন
চেনা চেনা—কোনো শেকসপীয়ৱেৰ নাটকেৰ চৰিৱেৰ মতো। কে

জিজ্ঞেস করলো, এবং কাকে ? ও খুব আস্তে আস্তে জানালা থেকে, তেরোর দিকে মুখ ফেরালো। তেরোর চোখের ঠলিটা খোলা। তার কালো উজ্জ্বল চোখের শাস্তি জিজ্ঞাস্ত দৃষ্টি ফুল্লরার মুখের দিকে। মুখে হাসি নেই গান্ধীর্ঘও নেই, শাস্তি আর নিরাবেগ, যা ওর চোখের সঙ্গে মেলে না। গন্তোর স্বগতোক্তির মতো জিজ্ঞেস করলো, ‘ফাস্ট’ স্টপেজটা কোথায়, জানেন ?’

ফুল্লরা তেরোর চোখের দিকে দেখলো, একটু অবাক হলো, বললো, ‘শুনেছি, কোলাঘাট !’

তেরো কোনো জবাব না দিয়ে, বেশ ক্রট ডান দিকে ঘাড় ফেরালো। অনু তখন, হিণ্ডেলিয়ামের ঘয়াটার বেটিল থেকে, বুবাইয়ের অন্ত গেলাসে জল ঢালছে। তেরো কুমারের দিকে ঝুঁকে পড়ে কৌ যেন বললো। ফুল্লরা অবাক চোখে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখছিল। কুমার বলে উঠলো, ‘আরে নিশ্চয় নিশ্চয়, এতে আর মনে করান কৈ আছে ?’ বলেই ডান দিকে তাকিয়ে বললো, ‘অনু, বুবাইয়ের জল থাওয়া হয়ে গেলে ঝুঁকে এক গেলাস জল দিও তো !’

অনুর হাতের গেলাস থেকে বুবাই তখন চুমুক দিয়ে জল পান করছে। সে তেরোর দিকে তাকালো। তেরোর মুখ থেকে ফুল্লরার দিকে। ফুল্লরার দৃষ্টি তখন কুমারের দিকে, ছজনের দৃষ্টিবিনিময় হলো। কুমারের ষ্টোটে সেই হাসি। অনু গেলাসের অবশিষ্ট জল বাইরে ফেলে। নিয়মরক্ষার্থে একটু ধূয়ে, এক গেলাস জল সাবধানে কুমারের দিকে এগিয়ে দিল। কিছু জল গায়ে আসন্নে পড়লোই, যা অনিবার্য চলমান গাড়িতে। কুমার তেরোর দিকে গেলাস এগিয়ে দিয়ে বললো, ‘আশুন !’

তেরো গেলাসটা নিয়ে, প্রায় এক চুমুকেই যেন সব জল শুষে নিল। কুমার জিজ্ঞেস করলো, ‘আর নেবেন ?’

তেরো কুমারের দিকে ফিরে, অস্পষ্ট কিছু বললো, আর ঝাঁকড়া চুল মাথাটা ঝাঁকালো। ফুল্লরা তেরোর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কুমার

শৃঙ্খ গেলাস অনুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, ‘আর এক গেলাস দাও।’

ফুল্লরাব কানে এলো, ঠিক তুর পেছনের আসনের পুরুষস্বর, ‘মে আর আপনি কি বলবেন। আমি তো গোড়া থেকেই টের পেয়েছি।’

আর একটি স্বব শোনা গেল, ‘দেশটা রসাতলে গেল। কিন্তু কিছু বলতে যান, আপনাকেই অপমান করে দেবে।’

আগের স্বব ‘অপমান ? ধরে পেটাবে মশাই।’

কৌ বলতে, কাদের কথা বলছে ? তেরো দ্বিতীয় গেলাস শৃঙ্খ করালে, এবং কুমারকে গেলান ফিরিয়ে দিয়ে, কিছু বললো। কুমার বললো, ‘ওরকম হয়।’

তেবো গোজা হবার আগেই, ফুল্লরা সোজা হয়ে বসলো। তার আগেই, কুমারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। পিছনে শোরা গেস সেই সমবেত হাসি, এবং কথা : ‘তোব ভাতে কৌ ?’

অন্য স্বর, ‘বুকখান জহিল্যা যাইতে আছে। আদরির গান শুনবি ?’

ভিল্ল স্বর, ‘পঁয়াদাবো স্বকুমার।’

আবার সমবেত হাসি, এবং আর এক স্বর, ‘দে ফ্লাস্কটা, এক চুমুক আমিও দিই।’

ফুল্লরার মনে হলো সবই যেন কেমন রহস্যময় লাগছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। ফস্ক করে দেশলাইয়ের কাঠি জলে উঠলো, আর একরাশ ধোঁয়া ওর মুখের কাছে, জানালায় ছিটকে এলো। গুৰু, সস্তা ভাজা তামাকের। ফুল্লরা তৎক্ষণাত মুখে আঁচল চাপা দিল। তেরো বলে উঠলো, ‘ওহ, সরি আর্ম—।’ কথা শেষ না করে, ফুল্লরার মুখের সামনে বেগুনি ইজের পাঞ্জাবির হাত নড়িয়ে ধোঁয়া ওড়ালো। ফুল্লরা বিস্মিত বিরক্তিতে মুখটা পেছিয়ে নিল। মেটামরফোসিস অ্যাণ...
পড়ে গেল আসনের নিচে।

॥ চার ॥

পিছনের আঁ নের যাত্রী হজন কাদের বিষয়ে কথা বলছিল ? এই অনুসন্ধিৎসু 'স্তার সঙ্গেই, ফুল্লরা আসনের নিচে বইটার পড় যাওয়া দেখলো । লজ্জা পেলো, বিরক্ত তত্ত্বাব জন্ম। কারণ তেরো নম্বর আসলে, ভব্যাবশতই, শশব্যস্ত হয়ে, হাত নেড়ে শুর মুখের কাছ থেকে ধোঁয়া সরিয়ে দিতে চেয়েছিল । কিন্তু গাড়ির ভিতরে, সামনের দেশের লোকে বেশ বড় করেই ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, শ্বোকিং স্টিক্টলি প্রাইভিটেড । তেরো নম্বর নিশ্চয় ইংরেজি পড়তে পারে ? প্রশ্ন বাহল্য, 'ওহ সরি'-তেই বোঝা গিয়েছে, আর সঙ্গের 'মেটামরফোসিস...' । অবিশ্যি, ফুল্লরা ইতিপূর্বেই যেন হৃ-এক জনকে সিগারেট ধরিয়ে টানতে দেখেছে, নাকি কেবল গন্ধ পেয়েছে ? কুমারকে একবারো বাসে ওঠার পর সিগারেট ঠোটে নিতে দেখা যায়নি । অথচ তার একটা সিগারেটের পর, আর একটা জলতে ঘেশি দেরি হয় না, প্রায় চেন শ্বোকার । ফুল্লরা কুমারের দিকে তাকালো । কুমার তখন পিছন ফিরে কিছু দেখছে, তার চোখে জরুটি অনুসন্ধিৎসা । ফুল্লরাও কুমারের দৃষ্টির অক্ষে পিছন ফিরে দেখতে গেল, আর তখনই শুর নাকে সিগারেটের ধোঁয়া লাগলো । ধোঁয়া তেরোর সিগারেটের ভেবে, আবার সামনে ফেরার আগেই শুর পিছনের আসনের একজনের হাতে, জলস্ত সিগারেট দেখতে পেলো, এবং শুনতে পেলো, 'দেখুন দেখুন, ব্যাপার দেখে বুঝতে পারছেন না ?'

ফুল্লরা যাত্রীটির মুখ দেখতে পেলো না, কেবল তার সাদা পাঞ্চাক্ষির

ଚୋଲା । ହାତର ଖାନିକଟା ଆର ମୋଟା ମୋଟା ଆର କାଳୋ ଆଗୁଳ ଚେପେ ଧବା ମିଗାରେଟଟି ଛାଡ଼ା । ଜବାବେ, ପାଶେବ ଯାତ୍ରୀର ସବ ଶୋନା ଗେଲ, ‘ଓ ଆବ ଦେଖବୋ କି ମଶାଇ ? ମେଇ କି ବଲେ ନା, ପେଟେ ଭାତ ନେଇ, କିମେତେ ସିଂହବ ? ଏ ହଚ୍ଛେ ମେଇ ବ୍ୟାପାବ ?’

ପିଛନେବ ଅନ୍ତ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଟି କାସି ଜଡ଼ାନେ । ସ୍ଵରେ, ବୁକ ଥିଲ ଲାଗାର ମତୋ ହେସେ ଉଠିଲୋ । ଫୁଲ୍‌ବାବ ଘନେ ହଲୋ ହାନିତ । କମନ ଯେବ ଭାଲ୍‌ଗାବ । ଓ କୁମାରେ ଦୃଷ୍ଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକାଳୋ, ମେଟି ବିନ ଯାତ୍ରୀ, ଯାଦେବ ନାନାବକମ କବା ଆବ ହାସି, ପ୍ରାୟତ୍ ଉଲ୍‌ମେ ବା ଉତ୍ତଳେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଯାଦେବ ‘ଆନଲାକି’ କଥାଟା ଏକାନ୍ତର ଫୁଲ୍‌ବାବ ଉଦ୍‌ଦେଶେ ଗାତ୍ରମଧ୍ୟେ କ୍ରୟେକବାଦ ଉଚ୍ଚାବିତ ହେବେହେ । ଶୁଣେବ ଫୁଲ୍‌ବାବ କିଛୁ ଯାଯ ଆସେ ନା ଓ ବକମ ତତ୍ତ୍ବର୍ତ୍ତ ନଜର, ହାମ ଆବ ଫୁଟକାଟା ଜୌବନେ ଘନେକ ଶୁନେହେ । ଏକେବାବେ ଗାୟେ ଲାଗେ ନା, ତା ବଳା ଯାଯ ନା, କିନ୍ତୁ ଲାଗାଟ ଜାନିତେ ଦିଲେଇ ସର୍ବମାଶ । ଆଶ୍ରମେ ଘିଯେବ ତିଟା । ଏମବକେ ଶୁଣା ବଲେ ତିର୍ଡିକ ଦେଖ୍ୟା । କିନ୍ତୁ ତିନ ଜନେର ଘନ୍ୟ ଦୁଃଖ, ଦେଶ ଏଡ ମାପେବ ମିଲିଟାବି ଓଯାଟାବ ବଟଲ ନିଯେ ଟାନାଟାନି ଆବ ହାନାହାସ କବହେ କେନ ? ଯେ ହ ହାତେ ବୋତଳଟା ଧବେ ଆଛେ, ମେ ଟୋଟ ଟିପେ ଧାବେ ଏବେ ମାଥା ନାଡିଛେ, ଯେ ଟାନିଛେ ମେ ବିରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଅନୁନୟ କବେ ବଲଛେ, ‘ଦେ-ନା ମାଟିବି,’ ଏବକମ କରାହସ କେନ ?’

କୁମାବ ଆବାବ ସାମନେର ଦିକେ ମୁଖ ଫେରାଳୋ, ଏବଂ ଫେରାତେ ଗିଯେଇ, ଫୁଲ୍‌ବାବ ମଙ୍ଗେ ତାବ ଚୋଥାଚୋଥି ହୟେ ଗେଲ, ଏବଂ ମଙ୍ଗେ ମଙ୍ଗେ ଚୋଥେର ପାତା କେପେ କୁଚକେ ଏକଟି ଇଶାରା କବଲୋ ମେ । ଗାବପାଦଇ ହାସି । ଫୁଲ୍‌ବାବ ଅପ୍ରକୃତ, ଆକଞ୍ଚିକ ଏହି ଇଶାରା ଆବ ହାସିତେ ଏବଂ ଓ ଆଶେପାଶେର ଯାତ୍ରୀଦେବ ବିଷୟେ ଏତୋ ବେଶ ମଚେତନ ହୟେ ଓଠେ, ଓ ବୁକ କୁଚକେ ଉଠିଲୋ । ବିରଙ୍ଗ ହୟେ ମୁଖ ସାମନେର ଦିକେ ଫେରାଳୋ । ବିବନ୍ଦିକର, ସତି, କାରଣ କୁମାରଦା କଥନୋ ଅନ୍ତାନ୍ତଦେବ ବିଥା ଘନେ ରାଖେ ନା । ଲୋକେ କତୋ କୌ ଭାବତେ ପାରେ । ଏକବାର ନାମତେ ପାରିଲେ ହୟ, କ୍ରୟେକ ଘା ମାରିତେଇ ହବେ ।

ଫୁଲ୍‌ବାବ ସାମନେର ଦିକେ ତାକାଳୋ, ବୀଘେ ମାଥା କିଛୁଟା ହେଲିଯେ । ଓ ର

চুল উড়ছে, গালে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। বৃহৎ চোখ ঢাকা কাঁচের জন্য
তাকাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু মনে হচ্ছে, মাথায় একটা রুমাল বাঁধতে
পারলে ভালো হতো। নিদেন, ঘাড়ের কাছে মাঝামাঝি, রবারের
বাঁধুনি। ও হু হাতে চুল টেনে পেছন দিকে টেনে দিল, দিয়ে একটা
আলতো মোচড়ও দিল, যেন উড়ন্ত গোছা একটু স্থির থাকে। আঁচল
সরে গেল বুক থেকে, এখন ওর গায়ে রোদ নেই। রোদ বুবাইদের
জামালার দিকে। পিছন থেকে হাত এনে, আঁচল টেনে বুক ঢাকতে
গিয়ে, নিজের বক্ষাস্ত্রের দিকে ওর চোখ পড়লো। অনেকখানি দেখা
যাচ্ছে। আঁচলটা টানতে টানতেই ও বটিতি চোখের পাতা তুলে
তেরোর দিকে একবার দেখলো। তেরোর চোখে এখন আবার সেই
মুখোশের মতো কালো ঠুলি আঁটা, ওর চুল দাঢ়ি অল্প উড়ছে। ফুল্লরার
মনে হলো, ছেলেটা যেন পাথরের মূর্তির মতো <মে অছে। আসনের
পিছনে, হেলান দিয়ে বসা সত্ত্বেও যেন, ওর জায়গার অভাব, তাই বসে
আছে সোজা আড়ষ্টভাবে, হু হাত দুই মোটা শক্ত উরুর ওপর। কিন্তু
সিগারেটটা গেল কোথায়? এর মধ্যেই একটা পুরো সিগারেট শেব
হবার কথা না। ফুল্লরা অবাক হয়ে, তেরোর মুখের দিকে তাকালো।
না, ঠোঁটে নেই। ফেলে দিয়েছে নাকি?

ফস করে দেশলাইয়ের কাঠি জলে ঝঠার শব্দ হলো। ফুল্লরা
দেখলো, কয়েক সারি এগিয়ে, সামনের ডান দিকে, কাঠির জলন্ত
শিখায় সিগারেট স্পর্শ করছে। ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল, বাঁ দিকের
সামনের দরজার কাছে। সহিস বা ক্লিনার, যাই হোক, অল্পবয়সী
ছেলেটির মুখ দেখা যাচ্ছে না, শরীরের খানিকটা অংশ ছাড়া। ধোঁয়া
সেখান থেকেই উড়ছে। ধূমপান নিষেধের বহুরটা ভালোই চলছে।
কিন্তু তেরোর সিগারেট? এখন আর লজ্জা না, তেরোকে বিরক্তি
দেখাবার জন্য। মন খারাপ হচ্ছে। তেরো নিশ্চয়ই সিগারেটটা
ফেলে দিয়েছে, আর তা ওর মুখ সরিয়ে বিরক্ত হওয়ার জন্যই। অবিষ্কি,
ঠিকই, ভাজা তামাকের একরাশ ধোঁয়া হঠাত নিখাসে চুকতেই, ওর খুব

খারাপ লেগেছিল এবং স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যা ঘটবার, তা-ই ঘটেছিল। ফুলরা তো প্রস্তুত ছিল না। কুমারের সিগারেটের বেঁয়াও যদি ওরকম হঠাতে নিশাসের মধ্যে ঢুকতো, ফুলরা ওবকমষ্ট করতো। ব্যাপারটা মোটেই ব্যক্তিকে পছন্দ অপছন্দের না।

ফুলরা নিজের সমর্থনে যুক্তি দিয়ে দোড় করাবার চেষ্টা করলেও, ওর মনের রেকর্ড পাক খেতে আরম্ভ করেছে, আর অনিবার্য ভাবেই, বিঁধেছে কাটা। ফলে, মন খারাপ, অস্থির তরঙ্গে তরঙ্গে। ওর মনে হচ্ছে, তেবো পাথরের মূর্তির মতো বসে, সামনে পিছনে ধূমপাণ্ডীদের ধূমপান লক্ষ্য করেছে, আর চোখের কোণ দিয়ে ফুলরার দিকে তাকিয়ে মনে মনে হাসছে। অবিশ্বিত হেলেটার ঠুলি আঁচা, গোফ দাঁড়ি ভরা মুখ দেখে, হাসির কথা ভাবাই যায় না এবং চোখের কোণে তাকানোও। নরং ও যেমন রেগে গন্তব্য হয়ে আছে, আর এমন একটা উদাসীন শা ওর ভঙ্গিতে, যেন ও বিশেষ রকমেই স্বতন্ত্র।। এ ভাবটা আবো খারাপ, কারণ ধূমপানের মতোই, ফুলরার আচরণকেও তুচ্ছ করে দেখছে।

ফুলরা গেরোর পায়ের দিকে একবাব দেখাব চেষ্টা করলো। না, তেনোর সেই ফোম পাকানো মোটা দড়ির মতো জুতো পরা পা ছটো দেখা যাচ্ছে না, সন্তুষ্টভাবে নিচে, সিগারেটটা চাপা পড়েছে। ওর কানের ভেতরে ঝাঁজিয়ে, পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইলো বাসের হর্নের হঁকার। যেমন এঙ্গিনের শ্যাপা গর্জন, তেমনই দৈত্যের হঁকার হর্নে। আর কৌ লম্বা হঁকার, যেন থামবে না। ফুলরা চোখ নিয়ে বাস্তার দিকে তাকালো। একটা বড় ইংরেজ ‘এস’ অঙ্গুবে, ছুটো বাঁক। বাসটা এ পাশে ও পাশে প্রায় টাঙ্গ খেয়ে মোড় নিচ্ছে। ছেটিখাটো একটা ভিড় পেরিয়ে গেল পলকেই এবং একটা চিৎকারের অংশ-বিশেষ, ‘সালা মেল...’ তারপরেই একটা ছাগলছানা, যেন গার্ডিন তলা থেকে বেরিয়েই ধারের দিকে ছুটে গেল। গাড়িটা ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা রাস্তা ধরলো। একটা লাল খলক চোখে মুখে শরীরে ছুঁয়ে গেল। অতি লাল-রক্তের মতো, শিমুল বা কৃষ্ণচূড়ার

থেকে গাঢ়, এতোবড় ফুল ঝাড়ালো। মাদারের গাছ সচরাচর চোখে
পড়ে না। মন্দার—সংস্কৃত, মাদার তার আটপৌরে নাম। কিন্তু তা-ই
কো? সংস্কৃত মাদারের শরীর কৌ কাটা ভরা?

আবার দেশলাইয়ের কাঠি জলে ঘোঁষার শব্দ, ডাইনে। ফুলরা
পিছনে হেলে ঘাড় ফেরালো। কুমার সিগারেট ধরাচ্ছে। ছি!
সমস্ত ব্যাপারটা আরো খারাপ চেহারা নিল। বিন্দু কাঁটাটা এখন
অস্বস্তির ক্রত রেণায়। কুমার ওর নিজের লোক। সেও কি না শেষে
সিগারেট ধরালো? তেরো নিষ্ঠয়ই ওর বিদ্যুটে ঠুলির কোণ দিয়ে
দেখছে, আর মনটা আরো শক্ত হয়ে উঠচ্ছে, আরো স্বতন্ত্রতরো ভাবছে
নিজেকে। কুমার টেঁট ছুঁচলো কবে, ধোঁয়া ফুঁ দিয়ে ছাড়তে ছাড়তে
ফুলরার দিকে তাকালো। চোখাচোখি হতেই, সিগারেটের দিকে
ইধারা করে দেখিয়ে জিজ্ঞাসার ভঙ্গি করলো। অসহ! সিগারেটটা
টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। ও সামনের দেওয়ালের দিকে ইচ্ছে
করেই তাকালো, নিষেধের বোর্ডটার দিকে, তারপর আবার কুমারের
দিকে। কুমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো না, কিংবা ইচ্ছা করেই বুঝলো
ন, সামনের দিকে দেখলো না। সিগারেটটা তর্জনী মধ্যমা আর
বৃক্ষাঙ্গুষ্ঠে বিশেষ ভঙ্গিতে ধরা, টোটে হাসি।

ফুলরা টোটে টোট টিপে চোখের পাতা কুঁচকে একটুও না হেসে,
কুমারের দিকে দেখলো। তারপরে দিদির দিকে তাকিয়ে দেখলো,
রঞ্জীন পত্রিকাটা ও দেখছে। বুবাই বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।
ওর ভূরু পর্যন্ত কপাল উড়ন্ট চুলে ঢাক।

তেরো অনায়াসেই সিগারেট টানতে পারতো। আসলে সে হাতটা
মুখের কাছে তাড়াতাড়ি তুলে এনেছিল বলেই তো, ফুলরা বেশি বিরক্ত
হয়ে, মুখটা সরিয়ে নিয়েছিল। সামনের আসনের জানালার ধারের
লোকটি ঘুমোচ্ছে, বুঝতে অশ্রুবিধা হয় না। মাথা একবার ডাইনে,
একবার বাঁয়ে চলে পড়ছে।...অথচ তেরো কাছেই জল চেয়ে
ফুলরার দিদির দেওয়া গেলাসে পান করেছে। সিগারেটের ব্যাপারে

এতেটা সিরিয়স হয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না...কিন্তু যারা এরকম গাড়িতে যেতে যেতে ঘুমে ঢলে পড়ে, দেখা যায়, তারা সব সময়েই তার পাশের লোকটির গায়েই ঢলে পড়ে। যেন, ঠিক পাশের : লোকটার গায়েই ঘুমের শয়ার চুম্বক লেগে থাকে। কেন ? এখনো ঠিক সেইরকমই ঘটছে। পাশের ডান দিকের লোকটি মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে। আর ঘুমে তুলুচুলু মাথাটা তার ঘাড়ের ওপরেই বারে বারে গিয়ে পড়ছে। বায়ে, জানালাব ওপরেও পড়তে পারে। বাতাসে নিষ্পত্তি ধাক্কা দিয়ে ডাইনে সরিয়ে দিচ্ছে না। খবরের কাগজ পড়ুয়া যাত্রীটি কাঁধ উচু করে, যথেষ্ট ভদ্রতা বজায় রেখেই ঘুমন্তুর মাথা সরিয়ে দিচ্ছে। তার বেশি কিছু না, একরকম যেন অভ্যাসবশতই। যথেষ্ট ধৈর্য আছে বলতে হবে। কিন্তু, মেটামরফোসিস...এর কৌ হবে ? হটা কি ফুল্লরার পায়ের কাছেই পড়ে থাকবে নাকি ?

ফুল্লরা কোমরের আঁচলটা কিছুকিঞ্চিৎ সাবাস্ত করার চেষ্টাতেই যেন, নিজের কোলের দিকে তাকালোঁ। ফলে, মেদহীন খোলা পেটের ওপর থেকে শাড়ি সরে গেল। ও তা লক্ষ্য করলো না, আসলে দেখবার চেষ্টা করলো বইটা, পায়ে ঠেকছে কৌ না ? না ঠেকলেও প্রায় পায়ের কাছে। ও পাটা একটু সরিয়ে নিল।

হঠাৎ পুরুষের হোহো হাসির সঙ্গে, স্ত্রী-গলার হাসি, কিছুটা নিচু-ধাপে শোনা গেল। ফুল্লরার প্রথমে মনে হলো, দিদি আর কুমারদা। আসলে তা না, ডান দিকের কয়েক সারি এগিয়ে, একটি আসন থেকে তিনি জনেই হাসছে। তাদের বসাটা বেশ কৌতুহলী করে। নিম্ন ত্রিশ, নাতিদৌর্য পুষ্ট শরীর, ছোট গলা, ঝাঁট বাঁধাকপির মতো খোপা মহিলাটির দৃশ্যে দুজন পুরুষ। একজনের ধূতি পাঞ্চাবি, ছোট ছেট ধূসর চুল, আর একজনের হাইনেককলার শার্ট, কলারের উপর দিয়ে বেয়ে পড়া লম্বা লম্বা কালো চুল, (অবিশ্বি তেরোর মতো না, তেরোর ঘাড়ের কাছে চুল আরো বেশি ঘন আর কেঁকড়ানো।) চওড়া শক্ত

কাঁধ। হাসির ইতিমুহূর্তেই মহিলার স্বর শোনা গেল, ‘এই চুপ! ক’
হচ্ছে !’

তৎক্ষণাত পুরুষ দুজনের হাসি থেমে গেল, মন্ত্রের মতো। কারোরই
মুখ দেখা যাচ্ছে না। বাঁ দিকে, লম্বা চুল শাট গায়ে পুরুষের মুখ ডাইনে,
একটা নিচে ঝোকানো, বেশ একটা নিবিড়তা আছে ভঙ্গিতে। বোঝা
গেল, সে বলছে, ‘কিন্তু যাই বলো, সতরো নস্বরের নিচেরটায়—আমি
তো—’ কথাটা পুরো শোনা গেল না, মহিলার শরীরে যেন একটু
বেশি ঝঁকুনি লাগলো। লম্বা চুল শাট গায়ে, দুহাতে মুখ ঢাকলো।
হাসচে বোধ হয়। কারণ, ধূসব চুল পাঞ্জাবি গায়ে, বাঁ দিক ফিরে তাব
দিকে তাকিয়েই হাসছে। মহিলার মাথা অনেকটা পিছনে হেলানো।
এমন না কী যে, ফুলবা কথনো সিগারেট মুখে নেয়নি, তার স্বাদ ওব
জানা নেই। অতি বিশ্রী স্বাদ। অতএব, ওর এমন কোনো তোলো
মুখ যেমসাহেবি দাবি নেই, সামনে কেউ সিগারেট খেলে, অনুমতি
চাওয়ার কেতা দেখাতে হবে। দেখালে ভালো, অনুমতি দিয়ে কৃতার্থ
করা যায়। না চাইলেও ক্ষতি কৌ? কিন্তু—আচ্ছা, তেরো আসলে
ঘুমোচ্ছে না তো?

‘আপনি আমাকে আর কী বলবেন, আমি জানি না?’ পিছনের
যাত্রীর স্বর। ‘আমার সব দেখা আছে। কী মেয়ে, আর কী ছেলে।
তা এ গো আবার সব আমোদ-সফরে বেরিয়েছে,’

অন্ত জনের জবাব, ‘তা অবিশ্বিঠিক। কিন্তু গায়ে যে জালা ধরে
যায়। সামনে বসে যা খুশী তা-ই করবে? কিছু বলা যাবে না?’
আমরাও তো বেড়াতে বেরিয়েছি।’

‘আপনি তো মশাই শুভ হ্যাগার্ড!’ আর এক স্বর, ‘আপনি আবার
কী বলবেন, আমিই বা কী বলবো? আপনি তো পাড়ায় অনেক কিছু
দেখেন, বলতে পারেন?’

অন্ত স্বর, ‘পাড়া? মশাই পাড়া তো দূরের কথা, ঘরেই কি মুখ
খোলা যায়?’

কামি জড়ানো হাসি, যেন অতি আক্ষেপজনিত এক ধরনের লহরা-বিশেষ এবং তার মধ্যে কয়েকটি কথা ফাঁকে ফাঁকে শোনা গেল, ‘বাবাদের ঘরে ঘো-ঘো-ঘো-গে-র বাসা !’

‘ওঁম্মম্ম !’...একটা গোঙানি, তারপরেই, ‘আর একটু মাইরি—স্বপন !’ তারপরেই, ‘আহ, ভারি খচের আছিস তুই বানচ্যত্ত ! গু খশালা !’...

তারপরেই সমবেত হাসি। কথাগুলো ফুল্লরার কানে যেন বিঁধে গেল, খুব কৌতুহল হলেও ফিরে তাকাতে পারলো না কিছুতেই। তবু একবার চোখের কোণ দিয়ে কুমারের দিকে দেখলো। কুমার পিছন ফিরেই দেখছিল, মুখটা এইমাত্র ফিরিয়ে নিয়ে অনুর দিকে তাকালো। অনুও তাঁকয়েছিল কুমারের দিকে। কুমার সন্তুষ্টঃ নিঃশব্দে কিছু ইশারা বা ইঙ্গিত করলো। অনু ঝরুটি করে, ঠোটে ঠোট টিপে, একটু নাক কুঁচকে, আবার কোলের ওপর রঞ্জীন পত্রিকার দিকে চোখ দিল। বুবাই এখন তম্ময় হয়ে বাটীরের দিকে দেখছে, ওর ঘাড় থেকে বুক অবধি রোদ।

‘আদরির কথা কই, শুন মন দিয়া / শুন মন দিয়া শেগো, যতেক আবিয়াতো মাইয়া !’...অনেকটা পাঁচালীর সুরে, পিছন থেকে শোনা গেল।

বাধা দিল কেউ, ‘ভালো হচ্ছে না সুকুমার, চুপ কর বলছি !’

সন্তুষ্টঃ সুকুমারই, সন্তুষ্টঃ কারণ স্বরটা যেন নানান সুরে খেলছে, ‘তোমাদের শালা জানি !’ এখন শকুন্তলার গান এমনি করেই গাইতাম, নয় তো বিদ্যাশুন্দরের গান, তা হলে খুব ভাল লাগতো। আর আদরির কাহিনী রিয়্যাল সয়েল থেকে এসেছে কী না, খুব খারাপ লাগছে !’

বাধার অন্ত স্বর, ‘তোমাকে আর সয়েল দেখাতে হবে না !’

তথাপি, নিশ্চিন্তাই সুকুমারের গলা শোনা গেল, ‘হায় কি কমু কাপের কথা—হায় আদরির কাপের কথা/দিনে দিনে বাড়ে ষ্যান্ চালের ছটা !’...

‘চুপ ! স্বরূপার !’ এই স্বরের সঙ্গে সঙ্গেই, গানের মুখেই যেন
ঝাপটা পড়ে গেল। তারপরে গোঙানি এবং গোঙানির মধ্যেও, কথার
মতো কিছু শোনা গেল, তারপরে সমবেত হাসি।

তেরো পাথরের মূর্তির মতো, অভঙ্গ বিভঙ্গ। ঘুমোছে ? এরকম
একটা অথগু স্বতন্ত্রতা—একে কী বলে ? রেকর্ড ঘূরতে থাকলে, আর
কাটা তার বুকে বিধে গেলে কী হতে পারে, ফুল্লরা তার প্রমাণ,
কিন্তু ফুল্লরা তা জানে না। ও মুহূর্তেই একটা সিদ্ধান্ত নিল, আর ডান
দিকে ফিরে বললো, ‘আপনার বইটা নিচে আমার পায়ের কাছে পড়ে
গেছে !’

তেরো খুব অল্প বাঁ দিকে ঘাড় ফেরালো, যেন সূচিবিন্দু হয়ে ও
বসেছিল, এমনই ঝটিতি জাগ্রত ওর ভঙ্গি ! ওর স্বর শোনা গেল,
অবিকল সেই শেক্সপীয়ারের নাটকের অভিনেতার মতো, দৃঢ়াগত
গন্তৌর কিন্তু নিচু, ‘জানি। গাড়িটা যখন স্টপে গিয়ে দাঢ়াবে, তখন
তুলে নেবো। এখন অস্তুবিধে হচ্ছে !’

তেরোর কথা শেষ হতেই, বুবাইয়ের চিংকার শোনা গেল, ‘ওই যে
—ও—ই যে, রূপনারায়ণ !...’

ফুল্লরা জানালার দিকে তাকিয়ে, রূপনারায়ণের জলে রোদের
রেখা দেখতে পেলো।

॥ পাঁচ ॥

বাতাসের ঝাপটা যেন অতিমাত্রায় উল্লা হলো, রূপনারায়ণের বাতাস, সাবা গাড়িটার মধ্যে চুকে তোলপাড় করে দিল। উড়িয়ে নিল বুকেব কাপড়, ফুল্লবাব মতো অনেকেব। কিন্তু আচলটা যে তেরোৱ মুখের কাছে উড়ে যেতে পাৰে, ফুল্লবাব তা খেয়াল নেই, ও রূপনারায়ণ দেখতে, নদাৰ শুণাৰে, একটু দূৰে, ওৱট দিকে, কোলাঘাটের ইৱিগে-শনেৰ বাংলোটা দেখতে ভবিষ মগো, ওৱ ধাৰণা ওটা কাৰোৱ বাঢ়ি; মনে মনে বললো, ‘ইস্! কৌ সুন্দৰ বাঢ়ি! সবুজ মথমলেৰ মতো মঠটা!’

তেবো যতটা সন্তুষ ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখবাৰ চেষ্টা কৰছে, আচলটা ওৱ ঘাড়ে আৱ দাঢ়িতে ঝাপাঝাপি কৰছে। ফুল্লবাব একটা অমুভূতি হলো, ব্ৰিজেৰ শুপৰ দিয়ে, গাড়িটা যেন শুন্তে উড়ে চলেছে। হাওড়া থেকে মেদিনীপুৰ জেলায় প্ৰবেশ কৰতে গাড়ি, ফুল্লবা সেটা ও জানে না। ব্ৰিজ পাৰ হয়ে যেতেই, বাতাসটা ঝপ্প কৰে পড়ে গেল। বুবাইয়েৰ চিংকাৰ শোনা গেল, ‘একি বাবা, গাড়িটা দাঢ়াচ্ছে না কেন?’

ফুল্লবা ডান দিকে ফিরে তাকালো। কুমাৰ বললো, ‘দাঢ়াবে, স্টপ আসুক।’

বুবাই তা মানতে রাজো না, অভিযোগেৰ সুৱে চিংকাৰ কৰে বললো, ‘বাবে, তুমি যে বলেছিলে, কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীৰ ধাৰে?’

কুমাৰেৰ মুখে বিৱক্তি আৱ অষ্টমি মেশানো হাসি, যা সে বিনিময় কৰলো অমুৰ সঙ্গে।

ফুল্লরা স্পষ্ট দেখতে পেলো, দিদির মুখেও বুবাইয়ের জিজ্ঞাসাই, কিন্তু সেটা দিদির মতোই, এবং ফুল্লরারও একই জিজ্ঞাসা। ওরও ধারণা ছিল, কোলাঘাটের স্টপেজ মানে, কুপনারায়ণের ধারে। অথচ বাস্টা এখনো গর্জন করে, দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে, নদী পড়ে রাইলো অনেক পিছনে।

‘কুমার বললো, ‘কুপনারায়ণের ধারে মানে কী ? একেবারে নদীর ধারে তো দাঢ়াবে না। যেখানে বাসের স্টপেজ আছে, সেখানেই দাঢ়াবে।’

বুবাই রৌতিমতো অভিমান করে, অবিকল ওর মায়ের মতো বললো, ‘ধেত্, তুমি বড় বাজে কথা বলো। আমার একটুও ভালো লাগে না।’

ফুল্লরার দিকে কুমার তাকিয়ে, অস্তুত ভঙ্গিতে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল, চোখের পাতা বড়ে করে, বুবাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করলো। ফুল্লরা জোরে হেসে উঠতে গিয়ে, মুখে হাত চাপা দিল। ওর বীঁ দিকের গাল চুলে অনেকখানি ঢাকা। কুমারের দৃষ্টি তখনো ওর দিকে। কোনো ইঙ্গিত নেই, যেন খুব অবাক হয়ে, ফুল্লরাকে দেখছে। ফুল্লরার ভুক্ত কুঁচকে উঠলো। কুমারের চোখের দিকে ভালো করে দেখলো, এবং তারপরে নিজের বুকের দিকে। ওর মুখে ঝটিতি রঙের ছোপ লেগে গেল, তেরোর কোলের কাছে পড়ে থাকা আঁচলটা তাড়াতাড়ি টেনে বুকের উপর ঢাকা দিল, দিতে দিতেই এক পলকে তেরোর দিকে দেখে নিল। কালো ঠুঁটির দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝবার উপায় নেই। কেন যে লোকে এরকম বিক্রী নিকষ কালো ঠুঁটি পরে ? কী ধরনের লোকেরা এসব পরে ? কিন্তু ও কুমারের দিকে তাকালো না, বরং মনে মনে বললো, ‘পাজী !’ এবং বাইরের দিকে তাকাতেই, বাস্টা একটা দমকা দৈত্যের নিশাস ফেলার মতো শব্দ করে থেমে গেল। পিছন থেকে ঘোষণার ভঙ্গিতে শোনা গেল, ‘কোলাঘাট ! দশ মিনিট থামবে।’

গাড়ির ভিতরে সবাই যেন একসঙ্গে উঠে ছড়মুড় করে দরজার

দিকে ছুটলো। যদিশু প্রফুল্ল তা না। কেউ কেউ ছড়মুড় করে মাঝলো। একজন চিৎকার করলো, ‘এই সুকুমার ওরকম ছুটছিস কেন?’

জবাব শোনা গেল, ‘ওরে বাপ্তৱে, আমার ব্রাডার ফেটে যাবার যোগাড় হয়েছে।’

হাসি শোনা গেল, এবং সেই সঙ্গে, ‘শালা ম্যাঞ্জিমাম্ টেনেছে। ব্রাডারের আর দোষ কী?’

ফুল্লরার কানে কথাটা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ মনে হলো, ম্যাঞ্জিমাম্ টেনেছে। কথাটা কুমারদাদের ড্রিংক টেবিলের আসরেও শোনা যায়। তার মানে, তা হলো, রাম-এর গক্টা ওখান থেকেই আসছিল।

‘গরম সিঙ্গাড়! জিলিপি রসগোল্লা সন্দেশ আছে দিদিমণি, দেবো?’ ফুল্লরার জানালার ঠিক নিচেই, একটি খালি পা, হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলে, ওর দিকে তাকিয়েই জিজ্ঞেস করছে।

ফুল্লরা কুমারের দিকে চোখ ফেরাতে গিয়ে, হঠাৎই যেন একটা শৃঙ্খতা বোধ করলো। তেরো নম্বর কখন নেমে গিয়েছে, খেয়ালই করে নি। ও জানতো, ওকে একটা বাধা ডিঙিয়ে ডান দিকের আসনের দিকে তাকাতে হবে। ‘ও দেখলো’, কুমার তেরো নম্বর আসনের হাতল ধরে, ওর দিকেই ঝুঁকে পড়ে দাঢ়িয়ে আছে। বুবাই আর অমু আসন ছেড়ে উঠে দাঢ়িয়েছে। কুমারের চোখে সেই পাজীর হাসি, গাছালানো, বললো, ‘দেখতে পেলে?’

ফুল্লরা অবাক, ঝরুটি করে জিজ্ঞেস করলো, ‘কাকে?’

কুমার বললো, ‘তোমার পাশের লোকটিকে? এইমাত্র তো নেমে গেল।’

ফুল্লরা নিচু ধমকের স্তুরে বললো, ‘আমি মোটেই পাশের লোককে দেখছিলাম না।’

‘তবে বাইরের দিকে তাকিয়ে এতো করে কৌ দেখছিলে?’ কুমার কপট বিশ্বায়ে জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বললো, ‘আমি মোটেই কারোকে দেখছিলাম না। আমি আপনার মতো না, সকলের সব কিছু দেখে বেড়াবো।’

কুমারের ভুক কুচকে উঠলো এবার, চোখে জিজ্ঞাসা, আবার পলকেই ঠোটে হাসি ফোটে।

ফুল্লরার মুখে রঙ। আসলে ও স্বল্পত আঁচলের কথাটাই কুমারকে বলছিল। কুমার বললো, ‘আমি বুঝি সব কিছু দেখে বেড়াই লোকের দিকে চোখ পড়লে আমি কি করবো?’

ফুল্লরা মৃঢ়ি পাকিয়ে হাত তুললো। কুমার ঢাঢ়াতাড়ি সোজা হয়ে দাঢ়িয়ে বললো, চলো অনু, নিচে গিয়েছ খেয়ে আসি। বুবাই এসো। এসো ফুল্লরা।’

অনু বললো, ‘আমি তো নামবাব জন্ম দাঢ়িয়েই আছি। তুমি দেরি করছো।’

ফুল্লরা উঠে দাঢ়াতে দাঢ়াতে বললো, ‘কববে না? তা নইলে আমার পেছনে লাগা যাবে কে মন করে?’

‘পেছনে?’ বলেই ঠোটে ঠোট টিপে সুখ ফিরিয়ে একটু এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা লাল মুখে অনুর দিকে তাকালো। অনু হেসে উঠে বললো, ‘লোকটা ভাবি অসভ্য।’

ফুল্লরা বললো, ‘খুব মজা! এসো এসো কখনে পারো না। দাঢ়াও, পুরীতে একবার পৌছুই, তারপরে মন দেখাবো।’

কুমার পিছন ফিরে ডাকলো, ‘কই বুবাই, এসো।’ পরম্যহৃত্তেই তার গলার স্বরে বিশ্঵াস, ‘এসো, তুমি কাদেছো নাকি বুবাই? কেন?’

সকলেই বুবাইয়ের দিকে উৎসুক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো। দেখা গেল, সত্যি বুবাইয়ের চোখে জল, ঠোট ফোলানো। কাঙ্গা কাঙ্গা স্বরে ও বললো, ‘আমি নামবো না, বিচ্ছিরি এ জায়গাটা, এখানে ঝুপনারায়ণ নদী কোথায়?’

কুমার তাড়াতাড়ি পিছনে ফিরে এসে, বুবাইয়ের হাত ধরে বললো,

‘ওহ, তোমার মেইজন্ত কান্না পাচ্ছে? কিন্তু কী করবো বাবা বলো, গাড়িটা যে এখানেই এসে দাঢ়ায়। ঠিক আছে, আমি পরে তোমাকে একদিন কুপনারায়ণের বাবে আসাদা করে বেড়াতে নিয়ে আসবো।’

বুধাই বাবা, সঙ্গে দরজার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বোঝা গেল, এই মুহূর্তে সর্বৈক্ষণ্য আনন্দ থেকে ও বঞ্চিত, কুপনারায়ণকে আর দেখা যাবে না। সকলেন অনেক আনন্দ, ওর আনন্দ হিস একটি পুরু রাখা নান্দ, কুপনারায়ণের এর নান্দ।

ষষ্ঠি পিছনে ফুল্লুর ঘাবার আগে, পিছন কিন্তু তাকালো। মেই তিনজনের দস্তি নেই। ও ঠিক পিছনের আসনেই, তুইজন পঞ্চশোধৰ বাস্তু বসে আছেন। তুজনের হাতেই, তুটি অর্ধেক শোনা ছাড়ানো কলা, এবং তুজনেই ফুল্লুরার দিকে পাকিয়ে ছিল। ফুল্লুর মুখ ফিবিয়ে, সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মেই আসনের তিনজনও এখন পর্যন্ত নামে নি। মাঝখানে বাঁধাকপির মতো ঝেঁপা বাঁধা মহিলা, তৃপ্যাণে অন্দমবয়সী হৃৎ পুরুষ। সকলেই কিছু খাচ্ছে, এবং মহিলার গলায় শোনা গেল, ‘উভ, ত্রিজের ওপামে, আসবার সময় ডানদিকে পড়েছে পানিত্রাস, আর পানিত্রাসের পাশেই হলো সামতাবেড়ে। শব্দচন্দ্রের বাড়িটা আছে এখনে; আর মেই মহিলা।’

ফুল্লু! কথাটা শুনতে শুনতে, দরজার কাছ থেকে, মহিলার দিকে একবার না তাকিয়ে পারলো না। বাহ, মহিলার মুখটি ভাবি সুন্দর হও। একটু গোলমণ্ডো, মাংস একটু বেশি, কিন্তু প্রায় একজন সিনেমা জা-নেত্রীর মতো অবিকল। মেই অভিনেত্রীই নয় তো? ফুল্লুর নেমে গেল। সামনে অল্প বা কুমাৰ বুধাই, কারোকেই দেখতে পেলো না। এপাশে ওপাশে তাকালো, আর উখনই বুধাইয়ের ডাক শোনা গেল, ‘ফুলমামা, এখানে?’

ফুল্লু সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলা, দোকানের ভিতরে একটা বেঁকিতে তিন জনেই বসেছে। দিদি টিফিন কেরিয়ার খুলছে। সামনের নড়বড়ে টেবলের ওপরে ইতিমধ্যেই কিছু সিঙাড়া আর জিলিপি প্লেটে

পরিবেশিত। বুবাই হাসছে ঝুপনারায়ণের শোকটা এখন 'আর নেই..
এই ছ মিরিটের মধ্যেই। ফুল্লরার সঙ্গে কুমারের দৃষ্টিবিনিময় হলো।
কুমার ঠোট উল্টে, নৈরাশ্যের ভঙ্গি করলো, ডাকলো, 'এসো।'

কুমারকে মাঝখানে রেখে, অহু আর বুবাই ছ পাশে। ফুল্লরা ভুরু
কোচকাতে গিয়েও, গম্ভীর হয়ে রইলো। কুমারের ইশারাটা বুঝতে ওর
অশুবিধা হয় নি। তেরো নম্বরকে কুমার দেখতে পায় নি, ইঙ্গিতটা
তারই। তাতে ফুল্লবার কৌ? ফুল্লরা কি তেরোকে খুঁজছে? তেরোর
জন্ম মরছে? ও দোকানের মধ্যে ঢুকে, অহুর পাশে বসলো। অহু বললো
'ফুলি, সিঙাড়া আর জিলিপিণ্ডলো বেশ গরম আছে, খেতে আরম্ভ
কর।'

বলে, দোকানের একটি ছেলেকে উদ্দেশ করে আবার বললো, 'এই
যে, শুনছো ভাই, একটা খালি প্লেট দাও তো।'

ফুল্লরা লক্ষ্য করলো, ছেলেটা দোকানের মালিকের দিকে একবার
তাকালো। মালিকও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ছেলেটার দিকে একবার তাকালো,
এবং বললো, 'দে দে। মায়েদের মিষ্টি-টিষ্টি কি চাই, ঢাখ। চা ক'
কাপ দিতে হবে, জিজ্ঞেস কর।'

ফুল্লরা বুঝতে পারছে, খাবারের দোকানে বসে, টিফিন কেরিয়ারের
খাবার বের করে খাওয়াটা, দোকানদারের মোটেই মনঃপুত না।
স্বাভাবিক। তা হলে আর খাবারের দোকানটা আছে কী করতে?
ব্যাপারটা কুমারও লক্ষ্য করেছে, সে বলে উঠলো, 'দাদা, কিছু রসগোল্লা
এদিকে দিন। আর আপনাদের যা চায়ের কাপ দেখছি, এক কাপে
কিছু হবে না। আমাদের আট কাপ চা দিন, কিন্তু চা-টা একটু—।'

'ইস্পেশাল!' মূল দোকানী, যে টাকা পয়সা হিসাব করে নিচ্ছে,
সে চেঁচিয়ে বললো, 'আট কাপ ইস্পেশাল চা ভেতরে।'

অহু বলে উঠলো, 'তা বলে আট কাপ? এতো খাবে কে?'

কুমার বললো, 'আমার একলার জন্মাই চার কাপ। তোমার দুকাপ,
ফুল্লরার দুকাপ!'

‘আৱ আমাৰ ?’ বুবাই বলে উঠলো ।

কুমাৰ বললো, ‘তুমি আমাৰ চার কাপেৰ এক কাপ পাৰে ?’

বুবাই পোকা-খাওয়া দ্বাত বেৱ কৰে, চোখে ঝিলিক দিয়ে হাসলো ।
কুমাৰ তাকালো ফুলৱাৰ দিকে । ফুলৱা মুখে বিৱক্তি ফুটিয়ে বললো,
‘বাপকা বেটা । চা খাওয়া চাই ?’

বলে ও মুখ ফিরিয়ে নিল । ফিরিয়ে নেওয়াৰ ভঙ্গি দিয়ে বুঁধিয়ে
দিতে চাইলো, ও এখন কুমাৰেৰ ওপৰ চটে আছে ।

কুমাৰ বলে উঠলো, ‘ফুলু, ওই ছেলে তিনটেৰ কথাৰ্বার্তা সব
শুনছিল তো ?’

ফুলৱা জৰুটি-অবাক চোখে, কুমাৰেৰ দিকে তাকালো । কুমাৰ মুখে
একটি সিঙ্গাড়া পুৱে দিল । অনু বলে উঠলো, ‘যাচ্ছেতাই । ছেলেগুলো
এসপ্লানেড থেকেই ড্ৰিংক কৱতে কৱতে আসছে । আৱ কী সব আজেবাজে
কথা বলছিল । আমাৰ মনে হচ্ছিল, ফুলুকে নিয়েও ওৱা কিছু বলছিল ?’

কুমাৰ মুখে চৰ্বিত সিঙ্গাড়া নিয়ে বলল, ‘মনে হচ্ছিল মানে ? ৱেগুলোৰ
বলছিল । বেচাৱিদেৱ খুব গায়ে লেগেছে, ফুলুৰ পাশে ওৱা বসতে পায়
নি । সেইজন্তু বাবে বাবে আনলাকি থারটিন বলছিল ।’

ফুলৱা ও সেটা বিলক্ষণ অনুমান কৱেছিল । কিন্তু ঠিক ওৱাই যে
মঢ়পান—ৱাম খাচ্ছিল তা যথাৰ্থ ধৰতে পাৱে নি । ও একটা জিলিপি
হাতে তুলে নিয়ে বললো, ‘ওৱা ৱাম খাচ্ছিল, না ?’

কুমাৰ বললো, ‘হ্যাঁ । আমাৰ মনে হয়, মিলিটাৰি ওয়ার্টাৰ বোটলে
পুৱো এক বোতল রাম ঢেলে, জল মিশিয়ে নিয়েছে । এখন মনে হচ্ছে,
আমিও ওৱকম নিয়ে এলো পাৱতাম ।’

ফুলৱাৰ সঙ্গে অনুৱ দৃষ্টিবিনিময় হলো ! অনু বললো, ‘হ্যাঁ, তা না
হলে স্বৰিধে হতো কেমন কৱে ? তুমি মাতাল হয়ে, যা-তা আৱস্ত
কৱতে, আমাদেৱ ছু বোনকে সামলাতে হতো ।’

ফুলৱা বললো, ‘আমাৰ বয়ে গেছে । একগাড়ি প্যাসেঞ্জারৰ সামনে
আমি মোটেই মাতাল সামলাতে যেতাম না ।’

কুমার চোখ মুখ পাকিয়ে শক্ত করে বললো, ‘মাতাল মানে ? আমি কথনো মাতাল হই ?’

ফুল্লরা আর অন্ধ পবস্পরের দিকে তাকিয়ে, হেসে উঠলো। অন্ধ হঠাৎ চমকে বলে উঠলো, ‘এ কি করঙ্গিস বুবাই, তুই একলা চারটে সিঙাড়া খেয়ে ফেললি ? এই প্যাটিজ কে খাবে ?’

কুমার উঠে এসে, ফুল্লরার পাশে বসলো। ফুল্লরা ভুক কুচকে, সন্দিক্ষ চোখে ঢাকলো, নাসাবজ্ঞ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আসলে, রাগের থেকে, শুর ভয়ই বেশি। কুমার যে কৌ বলতে পাবে, আব না পাবে সবই অনুমানের বাইরে। ও বললো, ‘কৌ হলো, এখানে এসে বসলেন কেন ?’

কুমার বললো, ‘ছুদিক থেকে তাপ পাওয়া যাবে। একদিকে তুমি, আর একদিকে অন্ধ !’

ফুল্লরা জিলিপি চিবোতে চিবোতে বললো, ‘কেন বউ আর ছেলের তাপে চলছিল না ?’

‘দাঢ়াও, আব একটু বুড়ো হতে দাও, তারপরে তো ছেলেব তাতে তাতবো !’ কুমার বললো।

‘ফুল্লরা, বললো, ‘যাাতি ?’

অন্ধ হেসে উঠে, একটি চিকেন প্যাটিজ কুমারের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, ‘খন এটা খেয়ে নিজেকে তাতিয়ে নাও তো !’

ফুল্লরা শব্দ কবে হাসলো। কুমার চোখের ভঙ্গি করে বললো, ‘খুব যে অ্যা ? আচ্ছা, এর জবাব পরে হবে। খন বলো তো, তোমার পেছনের সোটের বুড়ো ছটোব কথাবার্তা শুনছিলে ?’

ফুল্লরা উৎসুক আর অনুসন্ধিৎসু হলো, জিজ্ঞেস করলো, ‘কিছু কিছু। কাদের নিয়ে কথা বলছিল শোক ছটো ? মনে হচ্ছিল, খুব রেগে গেছে ?’

কুমার বললো, ‘কাদের নিয়ে আবার ! ওই শ্রীমানদের নিয়েই, যারা ওয়াটার বোটল থেকে রাম্বানছিল। তাও তো তুমি শোক ছটোর

চোখ মুখের ভঙ্গি দেখনি। ক্ষমতা থাকলে ওরা বোধহয় ছেলে তিনটিকে বাস থেকে নামিয়ে দিতো।’

অনু একটি প্যাটিজ ফুল্লরাকে দিয়ে বললো, ‘সত্যি, ছেলেগুলো ভারি অসভ্যতা করছিল।’

‘আমার কিন্তু খুব মজা লাগছিল।’ কুমার বললো, ‘মুকুমার না কি নাম একজনের, যে আহ্লাদীর গান কবতে চাইছিল, ওর বন্ধুরা গাইতে দিচ্ছিল না। আমার কিন্তু খুব শুনতে ইচ্ছে করছিল।’

ফুল্লবা ঠোটে। রঙ বাঁচিয়ে, প্যাটিজে কামড় বসাচ্ছিল। কিন্তু না বসিয়ে, হেনে উঠে বললো, ‘আহ্লাদী আবার কোথায় শুনলেন। ও তো আছুরির গান করতে যাচ্ছিল।’

অনু বললো, ‘আছুরিও না, আদরি। পূরো বাঙাল উচ্চারণ।’

‘আর নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ভাল্গার।’ ফুল্লবা বলে উঠলো, ‘একগাড়ি পামেঞ্জাবের মধ্যে ওসব গাওয়া উচিত না।’

কুমার ফুল্লবাব দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললো, ‘পেছনের বুড়ো ছুটো কিন্তু তোমাকে—মানে, তোমাদের তুজনকেও খুব লক্ষ্য করছিল।’

ফুল্লরা ভুক কুচকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তার মানে ? আমাকে—আমাদের আবার কা লক্ষ্য করছিল ?’

কুমার কোনো জবাব না দিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে, প্যাটিজ চিবোতে লাগলো। ফুল্লরা ঝেঁজে উঠে বললো, ‘কুমারদা ভালো হবে না বলে দিচ্ছি। আমি কী করেছি যে আমাকে লক্ষ করবে ?’

কুমার ঢোক গিলে প্যাটিজ গলাধঃকরণ করে বললো, ‘তোমাকে না তোমাদের। লক্ষ্য আর কো করবে ? এই বইটা পড়ে যাওয়া, আচল্টা ইয়ে হয়ে যাওয়া—।’

অনু বলে উঠলো, ‘বেচারি ! বুঝলি ফুলু, তোর কুমারদার হিংসে হচ্ছে। ওই চুলদাড়িওয়ালা ছেলেটাকে, তোর কুমারদার জায়গায় বসিয়ে দিন, আর কুমারদা—।’

কুমার বাধা দিয়ে বলে উঠলো অনু, তুমি আমার দল থেকে চলে

যাচ্ছা ? আচ্ছা, তোমার বোনকেই জিজ্ঞেস করো, এদের মধ্যে কোনো
কথা হয়েছিল কী না ?'

ফুলরা বললো, 'কেন হবে না ? হয়েছিল। ও আমাকে একবার
জিজ্ঞেস করলো, ফাস্ট' স্টপেজটা কোথায় ? আর আমার পায়ের
কাছে শুর একটা বই পড়েছিল—এখনো নিশ্চয় পড়ে আছে, কাফ্কার
মেটামরফসিস অ্যাণ্ড আদার স্টোরিজ, আমি বলেছিলাম, আপনার
বইটা পড়ে আছে। ও বললো, পরে তুলে মেবো, এখন অস্থুবিধি
হবে !'

এই সময়ে দোকানের ছেলেটা চা দিয়ে গেল। অনু জিজ্ঞেস
করলো, 'কেন, অস্থুবিধি কেন ?'

ফুলরা বললো, 'তাহলে ওকে আমার কোলের ওপর পড়ে বইটা
তুলতে হতো, এটাই অস্থুবিধি !'

বুবাই যে ওদের কথা শুনছিল, কারোর খেয়াল ছিল না। ও বলে
উঠলো, 'ফুলমাসী, তোমার পাশের লোকটা ডাকাত, না ?'

ফুলরা হেসে উঠলো। কুমার বললো, 'ওরে সে যে কৌ ডাকাত !
ডাকাতিয়া বাঁশি !'

এবার অনু আর কুমারও জোরে হেসে উঠলো। ফুলরা ঘৃষি
তুললো, আর সেই মুহূর্তেই বাসের হন্টা যেন ক্ষ্যাপা চিৎকারে ঘন ঘন
বেজে উঠলো। তৎক্ষণাত একটা তাঢ়াহুড়ো পড়ে গেল। কুমার
বললো, 'যাহ, দশ মিনিট হয়ে গেল ? নাও নাও, তাঢ়াতাড়ি চা খেয়ে
নাও !'

একে চা পান করা ঠিক বলা যায় না। কোনোরকমে প্লেটে ঢেলে,
অল্লবিষ্ট র চুমুক দিয়ে, সবাই বাসে গিয়ে উঠলো। শুধু ফুলরাদের
দলটাই না, বেবাক যাত্রীদের একই অবস্থা। ড্রাইভার ইতিমধ্যে
এঙ্গিন স্টার্ট করে দিয়েছে। ফুলরা দেখলো, তেরো ওর আসনে আগেই
বসে গিয়েছে। ফুলরা এগিয়ে আসতে তেরো উঠে দাঢ়িয়ে, ওকে
শিতরে ঢুকতে দিল। গাড়িটা সেই মুহূর্তেই ঝাকুনি দিয়ে, চলতে

ଆରଣ୍ଡ କରିଲୋ । ଫୁଲରା ଆର ଏକଟୁ ହଜେଇ ପଡ଼େ ଯେତୋ, ସାମନେକ
ଆସନେର ପେଛନ ଧରେ ସାମଲିଯେ ନିଲ ।

ବାତାସ ଏଥିନ ଗରମ ହୟେ ଉଠିଛେ । ତବୁ ଭାଲୋ ଲାଗେ । ବାଇରେ
ବୋଦେର ଚେହାରା ଯେନ ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ରେଗେ ଓଠାର ମତୋ ଦେଖାଚେ । ତବୁ
ଭାଲୋ ଲାଗେ । ହପାଶେ ସବୁଜ ମାଠ, ଗାଛର ପାତାଯ ପାତାଯ ଡାଳେ
ଡାଳେ ଦୋଳାତୁଳି ଝାକ୍କାବାଙ୍କି ।

‘ଏଥିନ ଆର ଭୁଲ ହିଛେ ନା, ଫୁଲରା ସୋଷ ତୋ ?’

ଶୈକ୍ଷମ୍ପାଇସର ନାଟକେର ଅଭିନେତାର ମତୋ ମେହି ଭାରି ଆର ମୋଟା
ଗଲାଯ, ଜିଜ୍ଞାସାଟା ଶୁଣେ ଫୁଲରା ହତବାକ ଚୋଥେ, ତେରୋର ଦିକେ
ତାକାଲୋ । ତେରୋର ଚୋଥେର ଠୁଲି ଖୋଲା, ଓ ହାସଛେ । ଯେନ ଖୁବହି
ଚେମାଶୋନା ପରିଚିତ, ଏମନଭାବେ ହାସଛେ ।

॥ ছবি ॥

তেবোব দুধ গোকুলে, ডুলে চোখ ধাকনেও, তোব হঠাৎ অন্যাস
জিজ্ঞাসা, এম দুল আব চোখ জোড়া, আব নাক আব ঝকঝকে দাঙ-
গুলো, কেৱল চেনা চেনা টেকলো। ফুলবার চোখে জ্বরুটি-বিশয়
যদিও, চোখেব অনুন কৎসা বেশ তীব্র। ও চিনতে চাইছে। তবু
একটা অবিশ্বাস, একটা সংশয়, ছুঁয়ে থাকছে।

‘চিনতে পাবা যাচ্ছে না তো ? তা হলে আমাকেই বলতে হয়।
হঠাৎ চিনে নামটা বলে উঠলে, বিপদে পড়ে যাবো।’ তেবো আবাব
বল্সে উঠলে, যথ সেই হার্নি। আব সেই স্বর, সেই অভিনেতাৰ মঙ্গো,
কিন্তু আৱে। ‘নচু। ফুলবার যে-স্বৰকে মনে হয ক্লাসিক চৰিৰেৰ
উপযোগী, ওথেলো অথবা ম্যাকবেথ, এ-ধৰনেৰ স্বৰ ছাড়া মান্য না।

কাৰ এই স্বৰ ? কাৰ ? ফুলবার পরিচিতদেৰ মধ্যে ? এই
জিজ্ঞাসাটা গোৱ হতেষ্ট, ওৱ মন্তিক্ষেৰ অক্ষকাৰ ভিতৰটা দপ্ কৰে জলে
উঠলো। ওৱ চোখে বিদ্যুতেৰ ঝিলিক হেনে গেল, মুখ তুলে, ঠোঁট
খোলবাব উঠোগ কৰতেই, তেৱো নিজেৰ মুখৰ কাছে হাত তুলে, প্রায়
চুপিচুপি, বলে উঠলো, ‘বলো না বলো না, বুৰোছি চিনতে পোৱেছো।
নামটা মনে মনেই রাখো।’

ফুলৱা তবু না বলে পাবলো না, আব এত অবাক যে গলা প্রায়
কুকু, ‘তুমি ! আশৰ্য ! তুমি তো— ’

‘কিছুই না।’ তেৱো হাসতে হাসতে উচ্চাৰণ কৱলো, এবং নিচু
স্বৰে বললো, ‘আমাৰ কথা কিছু আলোচনা না কৱাই ভালো। এতক্ষণ
নিশ্চয়ই আমাৰ চোখেৰ টুলিটাকে খুব অসভ্য লাগছিল। এখন

অনুমতি করো তো আবার পরে ফেলি। খোলা চোখে বড় অস্তিত্ব বোধ করছি।'

ফুল্লরা বুঝতে পারলো, কমল—এককণ যে তেরো ছিল, ওর কথায় বাধা দিল। দিয়ে ঠিকই করেছে, কারণ ও যা বলতে যাচ্ছিল, কেউ শুনতে পেলে, কমলের পক্ষে সেটা বিপজ্জনক হতে পারতো। ও বলতে যাচ্ছিল, 'তুমি তো অনেককাল ধরে অ্যাবস্কও করে আছো।' ও বললো, 'হঁয়া অস্তিত্ব হলে নিশ্চয়ই গুটা পরবে। দরকারও বোধ হয়।'

'সত্য খুব দরকার।' কমল বলতে বলতে চোখের ঠুলি আঁটলো, ফুল্লরার দিকে তারিয়ে হাসলো।

ফুল্লরার বিশ্বাস কিছুতেই কাটতে চায় না, বললো, 'সত্য, আমি যেন এখনো বিশ্বাস করতে পারছি না, আমার পাশে তুমি বসে রয়েছো। তুমই বসোছিলে এককণ ! আর তুমই যে তেরো— !'

কমল মোটা গলায় শব্দ করে হেসে উঠলো। এবাব আর আস্তে না, সহজ স্বাভাবিক স্বরে বললো, 'আমিই যে তেরো, এ নামটাও খারাপ না—তেরো। কিন্তু আন্দাকি, পিছনের ফিটারস্রা তো তোমাকে অনেকবার শুনিয়েছে।'

ফুল্লরা হেসে উঠতে বললো, 'সেটা ঠিক খেয়াল রেখেছ তো ? কিন্তু ফিটারস্ মানে ?' ও ভুক্ত কোচকালো।

কমল হাসলো, ওর কোলের ওপরে রাখা বাঁ হাতের একটা ভঙ্গি করে বললো, 'এমনি বললাম আর কি, ওরা বেশ ফিট করে রেখেছে নিজেদের। ফিট যাকে বলে ?' আবার একটু হেসে বললো, 'মেকানিকালি কথাটা ধরো না। আসলে কিন্তু তুমই তেরো, তাই না ?'

ফুল্লরা লজ্জা পেলো, মুখে ছটা লাগলো, কমলের কালো ঠুলির দিকে তারিয়ে বললো, 'তার মানে আমি আন্দাকি !'

'না, লাকি !' কমল বললো, 'জানালার ধারটা তুমি চেয়েছিলে পেয়েছো। এর পরে আর আন্দাকি বলা যায় না।'

ফুল্লরা জানে, কুমারদা, দিদি, এমনকি বুবাইটাও এদিকেই অবাক

চোখে তাকিয়ে আছে। কেবল তাকিয়েই নেই, নিজেদের সঙ্গে অবাক দৃষ্টি বিনিয়ও করছে। কেবল কি দৃষ্টিবিনিময়! ইংরেজিতে যাকে বলে, ডায়িং, কৌতুহলে আর বিশ্বায়ে মরে যাচ্ছে। বিশেষ করে কুমারদা। মনে মনে বোধ হয় রেগেও যাচ্ছে। ফুল্লরা একবার তাকিয়েও দেখছে না, অথচ চোখে কালো ঠুলি পরা, গোফ দাঢ়িয়োলা সেই রহস্যময় তেরোর সঙ্গে এখন দিব্য হেসে কথা বলে চলেছে। দুজনের ‘তুমি’ সম্মোধনও নিশ্চয়ই শুনতে পাচ্ছে, আর কথাবার্তার অন্তরঙ্গ ভঙ্গি। অতঃপর নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করা যায়, ফুল্লরা একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবে, হাসবে, ঘাড় বাঁকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত দেবে।

ফুল্লরা কিছুই করবে না। মনে মনে বললো, কেন, আরো লাগো আমার পেছনে! ও কমলকে বললো, ‘তা সেদিক থেকে লাকিটী বলতে পারো। জানালার ধারটা পাবাব জন্ত যে কী ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছিলাম! ময়দান থেকে বাসটা ছাড়ার সময়েও তুমি যখন এলে না, আমাব কী একসাইটমেট! মনে মনে ভগবানকে পর্যন্ত ডেকে ফেললাম, তুমি যেন না আসো।’

কমল হা হা করে হেসে উঠসো, বললো, ‘ওহ! হোয়াট এ উইশ্বে! এ উইশ্বে ফর এ কিংডম-এর মতোই! বা এ কুইন কনসরট!’

ফুল্লরাও প্রায় খিলখিল করে হেসে উঠলো, কিন্তু ও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বললো, ‘তা যাই বলো, এই লঙ্গ জারনিতে একটা জানালা পাওয়া ভাগ্যের কথা।’

‘আর ভাগ্যস আমিই উঠেছিলাম।’ কমল বললো।

ফুল্লরা উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, ‘সেটা তো আরো ভয়। তোমাকে মাঝ-পথ থেকে বাস দাঢ়ি করিয়ে উঠতে দেখে তো ভাবলাম, জানালাটা গেল।’

‘কিন্তু আমি তোমাকে জানালাটা ছেড়েই দিতাম।’ কমল বললো, ‘আর যাই করি না কেন, অচেনা হলেও একটি ইয়ং মেয়েকে আমি জানালা-ছাড়া করতাম না।’

ফুল্লরা হেসে উঠতে গিয়ে থমকে গেল, কারণ হঠাৎ পিছন থেকে ছড়া কাটার স্বরে শোনা গেল, ‘হায় আদরি—আদরি লো এই কি দেখি চক্ষের মাথা খাইয়া/মনমোহন চাংড়া মরে তোর দেখা পাইয়া।’...

ছড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাসি, এবং একজনের প্রতিবাদ, ‘শালা, তোর তাতে কী। স্টপ অল ইওর আদরি মুইসেন্স।’

তৎক্ষণাত আবার ছড়ার স্বরে, ‘অই আদরি হায় আদরি, কাইল আছিলি ক্যাংঠা ল্যাংটা ছেমড়ি—।’

মুহূর্তেই আবার বাধা, ‘স্টপ স্বুকুমার, বাড় খাবি বলেছি।’

জবাবে শোনা গেল, ‘তবে আর যাই বলিস আনলাকি বলিস না। তোদের বরিঠাকুরের সেই গান্টার পঞ্জদশীকে এখন থেকে অয়োদশী বলিস।’

সমবেত হাসি। ফুল্লরা কমলের দিকে না তাকিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনছিল। ঠোটে ঠোটে টিপে, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে ছিল, আর নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছিল। যথার্থ রাগ না, অস্বস্তি বিরক্তি আর এক ধরনের ঠাণ্টা উপভোগের মতো, কিন্তু শেষের কথায় ও কমলের দিকে ফিরে বললো, ‘কী অসভ্য দেখেছো?’

কমলের দাঢ়ি গোফের ভাঙ্গে হাসি ফুটলো, খুব নিচু স্বরে বললো, ‘মন্দ কী! পূর্ণিমাতে অবসান, অয়োদশীই তো ভালো।’

ফুল্লরা জরুটি করলো। কমল হেসে, মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। এবার ফুল্লরার চোখ পড়লো কুমারের দিকে। কুমারের হাতে রঙীন একটা ম্যাগাজিন, কিন্তু সে এদিকেই তাকিয়ে ছিল।

ফুল্লরার চোখে চোখ পড়তেই, চোখ নামিয়ে নিল ম্যাগাজিনের দিকে। অমু অবিশ্ব জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে ছিল, এবং বুবাইও। ফুল্লরা হাসলো, অর্থপূর্ণ। বোঝাতে চাইলো, পরে জানাবে।

কিন্তু বুবাই ওকে জিভ ভেংচে জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। অমু হাসলো। ফুল্লরা অমুকে চোখের ইশারায় কুমারকে দেখালো। অমুর হাসি বিস্তৃত হলো, এবং ও বাঁ কহুই দিয়ে কুমারকে আল্গা ধোঁচা

দিল। কুমার ভুক্ত কুঁচকে অনুর দিকে তাকালো। অনু চোখের ইশাবায় ফুলবাকে দেখলো। কুমার ফুলবাব দিকে তাকালো। ফুলগু হাসলো টোট বাঁকিয়ে চোখের পাতা নাচালো। ভুক্ত কুঁচকেই ফুলবাকে দেখলো, এবং হঠাৎ যেন কিছু লবে, এইভাবে মুখ খুলতে গিয়েও একট ঘাড় বাঁকালো, তাবপরে পিছন ফিবে একবাব দেখলো, হচ্ছা কবেই, ফুলবাকে দেখিয়ে। ফুলবাব বুঝতে অসুবিধা হলো না, কুমার ওকে ছড়াব কথা মনে কিনিয়ে দিতে চাইছে।

কমল সিগাবেট ধ্বালো। ফুলবাব নাকে ভাজা তামাকের একবাশ ধোয়া ঢুকতেই, ও অকুটি কবে, মুখ সরিয়ে নিল জানালাব দিকে, বললো ‘ওমহ ! শ্বেকিং প্রোহিবিটেড না ?’

কমল বললো, ‘প্রহিবিটেড ! কন্ত লঙ্ঘ জাবনিতে, একট জানালাব মতোই, শ্বেকিং ইজ ভোব মাচ্ মেসেসিটি ’

কমলেব কালো গোফেব নিচে স্বার্ভারিক লাল টোটেব ফাঁকে সামা ঘকঘকে দাঁতের হাসি ফুটলো।

ফুলবা নাক কুঁচকে হাসলো। কমল আবাব বললো, ‘অবিশ্বি আমার ব্র্যাণ্ট সন্তাৰ, গন্ধটাও বেশ বড়া ।’

‘কড়া না, কটু !’ ফুলবা বললো, এবং হাসলো, আবাব বললো। ‘আচ্ছা জেড - ।’

কমল নংকণাঃ দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে একটা শব্দ কবলো। একট কাত হয়ে, মুখ নামিয়ে বললো, ‘নামটামণ্ডলো মনে মনেই বাখো না : আৱ যদি ডাকতেই হয়, তেৱে টেজ বেস্ট !’

ফুলবা থতিয়ে উঠেছিল। কমলেব কথা শুনে হাসলো, বললো, ‘তেও বলে ডাকবো ?’

‘ক্ষতি কৌ ?’ কমল বললো, ‘আমার নামধাৰ আসল পরিচয়টা আপাতত ভুলে যাও !’

ফুলবা বললো, ‘তা কৌ করে সন্তু ? তোমার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, আমি কথা বলছি কৌ করে ?’

‘ওই পর্যন্তই, পরিচয় একটা আছে।’ কমল বললো, ‘কিন্তু আমি
কে, সেটা মনে মনেই রাখো। তুমি আমার অবস্থা নিশ্চয়ই কিছুটা
অনুমান করতে পারছো?’

ফুল্লরা বললো, ‘পারছি তুমি এখন—।’

‘হ্ম! আমি এখন পুরী যাচ্ছি।’ কমল বাধা দিয়ে বলে উঠলো,
এবং হাসলো।

ফুল্লবাব মনে তলো, কমলের চোখের ঠুলিতে যেন একটা ইশারা
থেলে গেল। মনে হওয়া ছাড়া আব কিছু না, দেখতে পাওয়ার কোনো
প্রশ্নই নেই। ও স্বর নিচু করে বললো, ‘আমি ভাবতেই পারিনি
তোমাকে কলকাতায় দেখবো, তাও আবাব এই বাসে। আমি
ভেবেছিলাম, তুম—।’

‘কোনো জঙ্গলে?’ কমল হেসে বললো।

ফুল্লরা বললো, ‘না, হয়তো কোনো জেলে।’

‘ও শব্দটা উচ্চারণ করো না।’ কমল বললো, ‘কথাবার্তায়
ওদিকেই যেও না।’ কমল গঙ্গার স্বর আরো খাদে নামালো,
‘অ্যাবস্কণ, জেল, এসব শব্দ একদম অ্যাভয়েড করবে। আমি এখন
কোথায় ঢাকরি করছি, বিয়ে করেছি কী না, বউ দেখতে কেমন, ক’টি
ছেলেমেয়ে, এসব জিজ্ঞেস করতে পারো না।’

ফুল্লরা কথাগুলো শুনতে শুনতে এতো অবাক হয়ে যাচ্ছিল, আপনা
থেকেই ওর টেঁট ফাঁক হয়ে গেল, চোখের বিশ্বায়ে রীতিমতো বিভাস্তি।
কমল বেশ শব্দ করেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই সামনের দিকে
ফিরে তাকালো। সামনের আসনগুলোর কেউ কেউ শুর এবং ফুল্লরার
দিকে ফিরে তাকালো। চোখে কৌতুহল, অনুসন্ধিৎস। পিছন থেকে
ছড়া শোনা গেল, ‘আই আদরি ডাগ্‌রি ছেমড়ি কী মন্ত্র তোর চক্ষে...।’

‘চুপ! নো আদরি অ্যাফেয়ার!’ সঙ্গে সঙ্গে বাধা, এবং প্রকৃতই
ছড়ার স্বর চুপ হয়ে যায়।

ফুল্লরা অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘তার মানে? সত্যি নাকি?’

‘সাত্য মিথ্যে তো পরের কথা।’ কমল বললো, ‘তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। পুরনো একজন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, এরকম জিজ্ঞেস করাই তো স্বাভাবিক, তাই না। তোমাকেও আমি জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কিন্তু তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তোমার বিষয়ে হয়নি।’

ফুল্লরাব চোখে হাসি চিকচিক করে উঠলো, এবং টোটেও। জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি করেছো নাকি।’

‘না।’

‘বারোর সঙ্গে—।’

‘নতুন করে কিছু ঘটেনি।’ কমল ফুল্লরাব জিজ্ঞাসার মধ্যেই বলে উঠলো।

ফুল্লরা ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখের পাতা নিবিড় করে জিজ্ঞেস করলো, ‘পুরনো কিছু আছে নাকি?’

কমল সিগারেটে টান দিয়ে বললো, ‘হয়তো ছিল, কিংবা ছিল না। ঠিক কিছু জানি না।’

ফুল্লরার স্থির দৃষ্টি কমলের চোখের নিকব কালো কাঁচের ওপরে। ওর ইচ্ছা হলো, কমলের চোখ ছুটো দেখবে। কালো কাঁচের ওপর, কমলের চোখ ছুটো ও কলনা করার চেষ্টা করলো। মোটা ভুঁরু নিচে, কালো টানা উজ্জ্বল চোখ। কিন্তু হঠাতে শুর কানে বেজে উঠলো, ‘কেমন করে ভালোবাসতে হয়, আমি জানি না। কিন্তু ভালোবাসতে ইচ্ছা করে।’ এবৎ কমলের কালো কাঁচের বুকে একটি ছবি ভেসে উঠলো; প্রায় একটি কিশোরের মুখ, যার ওপর-ঠোটের ওপর সবে মাত্র গোফের সবুজ রেখা দেখা দিয়েছে।

ফুল্লরা বললো, ‘কিছু জানো না বলছো, মেনে নিছি। কিছু বুঝতে পেরেছো তো?’

‘মানে?’

‘মানে, কিছু কিছু বিষয় জানার খেকেই বুঝতে হয় বেশি।’

‘তা হলে বুঝেছি ।’

‘কী ?’

কমল তৎক্ষণাত জবাব না দিয়ে, তুই আঙুলে টিপ করে, জানালা
দরে মিগারেটের শেষাংশ ছুঁড়ে ফেললো। ফুল্লরার উদ্গৌব দৃষ্টি
কমলের কানে ঠুলির ওপরে। কমল বললো, ‘বলতে পারছি না, কী
বুঝেছি !’

ফুল্লরা তথাপি তাকিয়ে রইলো। কমল সামনের দিকে তাকালো,
‘কন্ত আবার মুখ ফিরযে ফুল্লরার দিকে দেখলো, এবং হেসে বললো,
‘আসলে আম জানিন্টি না !’

ফুল্লরার দৃষ্টি আস্তে আস্তে অগ্রমনক্ষ হয়ে উঠলো।

॥ সাত ॥

ছ মাস মানেই এক বছর, ফুল্লরা মনে মনে হিসাব করে দেখলো। এম. এ. ফাইনাল পরৌক্ষা দিতে তিনি বছব লেগেছিল। ওর একলার না, ওদের বছরের সকলের। নির্ধারিত সময়ে পরৌক্ষা না হওয়া আর বাবে বাবে পেছিয়ে যাওয়ার প্রথম দিকের ভিক্টিম ছিল ফুল্লরারা। এ'দকে তিনি, ওদিকে অনার্দের সঙ্গে ডিগ্রী কোর্সের তিনি, ছ বছব। তার সঙ্গে আরো সতেরো মাস। বাঙলা হিসাবে সতেরো মাসকে দড় বছর বোঝায়, কিংবা বলা যায়, ছ বছর চলছে। তার মানে, সাত বছর পাঁচ মাস। ঠিক দিনের দিন হিসাব করে কি কমলের সঙ্গে শুর দেখা হয়েছিল?

মোটেই না। কমলকে সেইভাবে মনে রাখবার মতো কোনো ঘটনা ঘটেনি, কারণও অতএব নেই। অবিশ্ব চোখে না পড়ার মতো ছেলে কমল ছিল না। অনেকগুলো কারণ ছিল তার পিছনে। এখন ওর এই ঝাঁকড়া চুল আর গোফদাঙ্গিতে যাঢ়াকা পড়ে রয়েছে, ওর এই চোখ মুখ তখন দেখাতো কাটা কাটা। অনেকেরই যেমন সব মিলিয়ে একটি মুখ, তা শুন্দর বা মন্দ যা-ত হোক, কমলের যেন ঠিক সেই রকম ছিল না। যেমন শুর মোটা ভুক হুটো। প্রায় আট বছর আগের সেই প্রায় কিশোরের একটি মুখে, অনেকটা বেমানান লেগেছিল। কারণ সেই তুলনায়, চোখ দুটো ছিল কালো আর কিছুটা টানা। নাকটা মেয়েদের মতো টিকলো। কেবল টিকলো বললে ঠিক বলা হয় না। কেমন একটা তীক্ষ্ণতা, অর্থ খুব উচু না। ঠোট ছুটি ও সেইরকম। যেন আঁকা রেখায় লাল। চিবুকের ঠিক মাঝখানে একটি-

গভীর বেখা, যা এখন পুরোপুরি দাঢ়িতে ঢাকা। এখন ও মোটা না, কিন্তু দৈর্ঘ্যের সঙ্গে মেদবর্জিত পেশল শরীরকে সুগঠিত আর স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। তখন ছিল একহারা, রোগী বোগা, মাথার চুল ছোট করে ঢাটা। বোঝা যেতো, সে সময়ে, কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র যখন, ও দাঢ়ি কামাতো, কিন্তু গোফ কামাতো না। গোফের পাতলা সবুজ বেখা দেখলেই বোঝা যেতো। কিছুদিন না কামানোর জন্যই, ওর সারা গালে আর চিবুকেও হালকা সবুজ এড় দেখা দিত। ফসা ও বরাবরই, টিকটকে না, বাঙালী ফবসা যাকে বলে। এবকম বঙ্কেই বোধহয় টজ্জন্ম শ্যামবর্ণ নলে। অবিশ্বি, ফুল্লবাব ধাবণা, আজ পথন্ত যতগুলো এড় আবিকৃত হয়েছে, তাদের ওবিজিন আব মিকস্ড় কালার, সবগুলোই বাধ হয় বাঙালাদের শবাবের বড় ফোটাবাব জন্য দক্ষকাব হয়।

কমল তখন কিশোর না, তকণও না। ছয়ের মাঝামাঝি। অর্থচ, প্রকে যে এক কথায় মিষ্টি ছেলে মনে হলো, তা মোটেই না। ওন পাশাক আদাক হিল সময়ের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো মডার্ন। শ্বার্ট অবিগৃহ। ঠিক গহংকানী নয়, একটু গোক দেখানো বায়দাকানুন ছিল। আলাপ হবাব পবে, ফুল্লবা ও মুখে যখন প্রায়ই ‘পার্সোনালিটি’-এর কগা শুণতো, বুঝতে পারতো, কায়দাকানুনের ভাবভঙ্গগুলো ছিল ওব পার্সোনালিটির অভিব্যক্তি। কমল মুখে তা বলতো না। কিন্তু পার্সোনালিটি একটা মানুষের বৈশিষ্ট্যের পক্ষে বিশেব প্রয়োজন। কমল এ কথা বলতো। হাস্তকর। ফুল্লবাব মনে হতো। ব্যাকুলেব জন্য কোনো গঙ্গির দরকার হয় না। উটা ভিতরেব ব্যাপার। কমলের মন যে তখনো কঁচা, বোঝা যেতো।

কমল একটা গাড়িতে কলেজে আসতো। কখনো কখনো নিজেই ড্রাইভ করে আসতো। ও সম্পন্ন পরিবারেব ছেলে, ওর বাবা একজন ধ্যারিস্টার। ওর ঠাকুর্দা ও ছিলেন ব্যারিস্টার। কমল নিজেই বলতো, ‘আমাৰ ঠাকুৰ্দা ছিলেন ইংৰেজদেৱ খয়েৱ থী। আৱ আমাৰ বাবা এখনকাৰ সৱকাৱেৱ থয়েৱ থী। আমি পছন্দ কৱি না।’ ওৱ পছন্দ

অপছন্দে, পরিবারের কিছু আসতো যেতো বলে আদৌ মনে হতো না। হয়তো বাহাহুরি নেবার জন্তুই বলতো। কিন্তু বলতো খুব স্বাভাবিকভাবে। দারুণ ভাবভঙ্গি কবে না।

কমলের একটা দল ছিল। ছেলে আর মেয়েদের একটা দল। তাদের কারোকে কারোকে ও গাড়িতে করে কলেজে নিয়ে আসতো। খবর কবতো প্রচুর। কেবলমাত্র কফিব কাপ সামনে নিয়ে, জলের গেলাসে চূনুক দিয়ে, টেবল ধিবে আড়া দিত না। বকমাবি খাবাবে ডিশ্র্যু এব অর্ডাব হতো। কলেজ স্ট্রাই অপশ্ল থেকে চৌধঙ্গি পার্ক স্ট্রাই পর্যন্ত ওদেব আড়াব জাগুগা পিস্তু ত ছিল। আব সবটাই ডিল এমলকে কেন্দ্র করে।

কিন্তু কমল ঢাক্র হিমাণে ডিল ভালো। এব অন্যর্থ ডিল কে মিস্টীতে, হায়ার সেনেশনালক শুন যা বেঙাট ছিল, চালান্ত কবে মে বকম রেজাণ্ট কবা যায় ন।

ফুলরার সদ্বে পার্বচন্দ্র আগে, এমলকে ও যা য, মনে করতো, তার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ হলো, চানাক, অহংকারা, চালবাঙ, বড়লোকি দেখানো। যতো রকমের খারাপ হতে পাবে। ফুলরাব মনে কববার কতগুলো কারণ ছিলো। উত্তরবঙ্গের যে-শহর থেকে ও কলকাতাব কলেজে পড়তে এসেছিল, সে-শহরবে ওদেব পরিবারের পরিষেটা। বরাট। ওর বাবা ব্যারিস্টাৰ নন বট, ক্রিমিনাল ল'ইয়ার হিসাবে কয়েকটি জেলাব্যাপী মামডাক। এশপরম্পরা পেশা ও পশাৰ আইন ব্যবসা। ফুলরার বাবাৰ সম্পর্কে জ্ঞানকে বলে, ফাসিৰ আসামীৰ গলার দাঢ় খুলে, ফিরিয়ে আনতে পাবেন। উত্তরবঙ্গে ওদেব সম্পত্তি বা বাড়িৰ কথা আলাদা। কলকাতায় বিশেষ কবে গাড়িৰ অভাবটা ফুলরা খুব বেশি অনুভব কৰতো। শুদ্ধেৰ জেলা শহরে, ওকে কথনো গাড়ি ছাড়া বেৰ হতে হতো ন। কলকাতায় বাসে ঝুলে ওকে কলেজে আসতে হতো। বাড়িৰ গাড়িতে ক'রোকে কলেজে আসতে দেখলে, প্রথমেই শুন চোখেৰ সামনে ভেসে উঠতো ওদেব নিজেদেৱ গাড়িগুলো। একটা তো না,

তিনটে গাড়ি। অবিশ্বিষ্ট একান্নবর্তী পরিবারের। সেটা ফুল্লরাদের পারিবারিক খ্যাতির আর একটা কারণ। একসঙ্গে এতবড় পরিবার, বিশাল বাড়ি, অতিথিশালা, মন্দির, আর পূজাপার্বণ, রৌতিমতো জাঁকজমকের ব্যাপার।

ফুল্লবার চোখে, অতএব কমলের আচার আচরণ, ভালো লাগবার ব্যরণ ছিল না। দেমাকৌ আর চালাক মনে করতো। কিন্তু কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতে হলে ওকে যে কৃচ্ছসাধন করতেই হবে, সেটা আগেই দানা ছিল। কলকাতায় ওদের কিছুই নেই। কালীঘাটের কোথায় একটি বাড়ি আছে, ফুল্লরা যা কথনো চোখে দেখেনি। শুনেছে পূর্বপুক্ষদের তাৰ্থবাস বা আনন্দাদ কাজের জন্য বা গঙ্গাস্নানের জন্য বাড়িটি কেন হয়েছিল। এখন দৃবসম্পর্কের কোনো আঝৌয় পরিবার বাস করে। বাস করতে দেবাৰ একমাত্ৰ চুক্তি, প্ৰয়োজনে কেউ কথনো এলে, তাকে ধাকনাৰ জন্য ঘৰ হেঢ়ে দিতে হবে। ফুল্লরা জ্ঞানত কথনো ওদেৰ বাড়ি কাৰোকে কালীঘাটের সেই বাড়িতে যেতে দেখিনি।

প্ৰশ্ন উঠেছিল ফুল্লণা কলকাতায় কোথায় থেকে পড়বে। হস্টেলে, সেটাই স্বাভাৱিচ। বাবা কাকা জ্যাঠা, সবাই আপন্তি করেছিলেন। আঝৌয়-বাড়ি ছিল কিছু। জ্যাঠামশাইয়ের মামাৰ বাড়িৰ কথাই তাৰ মধ্যে বিশেষ কৰে উঠেছিল। অনু—ফুল্লবার দিদিৰ বাড়িৰ কথা ঘৰ্টেনি, তা না। কিন্তু জামাইয়ের বাড়িতে থেকে মেয়ে পড়বে সেটা কাৰোবাই মনঃপূত ছিল না।

যে-কোনো আঝৌয় থেকে, ফুল্লবার কাছে কুমাৰ ছিল অনেক বেশি আপন। দিদিকে নিয়ে তো কোনো কথাই নেই। কৃচ্ছসাধনে ওৱ আপৰ্যান্ত ছিল না, স্বাধীনতাৰ দাম ছিল তাৰ থেকে অনেক বেশি। কুমাৰেৰ সঙ্গে ওৱ সম্পর্ক গ্ৰীতি আৰ বন্ধুত্বপূৰ্ণ, তাৰ সঙ্গে দিদিৰ স্বেহ ভালোবাস। ফুল্লরা কলকাতায় বাস কৱবে, অথচ এদেৰ সামিধ্য পাৰে না, ভাবতেই পাৱতো না। ওৱ জয় সেখানে বাড়িকে রাঙ্গী কৱাতে

পেরেছিল। অবিশ্বি তার আগে, দিদি আর কুমারদাকে চিঠি লিখে রাস্তা তৈরি করেই রেখেছিল।

‘খুব চিন্তিত হয়ে পড়লে মনে হচ্ছে?’ কমল গস্তীর আর ভাঙা ভাঙা ঘরে বললো।

ফুলবা চমকিয়ে উঠে শব্দ করলো ‘ওঁয়া?’ তারপরেই লজ্জা পেয়ে হাসলো, বললো ‘চিন্তিত না, মনে পড়ছিল কয়েকটা কথা।’

কমল কিছু না জিজেস করে, ফুলবাব দিকে একবে রইলো। চোখে ঠুলি ঢাকা থাকলেও, ও যে ফুলরাকেই দেখছে, বোঝা যাচ্ছে।

ফুলরার মুখে রঙ বদলিয়ে গেল, লজ্জাটা বেশি অনুভব করলো। বললো, ‘পুরনো দিনের কথা।’

কমলের গোফদাড়ির ভাজের উজ্জলতা কিঞ্চিৎ মলিন হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তেই আবার হেসে উঠে জিজেস করলো, ‘কোন্ কথা বলো তো? আমার কোনো ছেলেমাঝুরির কথা?’

ফুলরা দেখলো, কমলের মোটা ভুক ঠুলি ছাপিয়ে কপালের দিকে বেঁকে উঠেছে। হেসে ঘাড় নেড়ে বললো, ‘তোমার না আমার ছেলেমাঝুরি।’

ফুলরার কথা শুনেও কমল তখনই মুখ ফিরিয়ে নিল না। ঠোঁটের হাসির সঙ্গে ভুক তেমনি চোখের ঠুলি ছাপিয়ে বেঁকেই আছে। ফুলরা যেন আবার নতুন করে লজ্জা পেয়ে গেল। মুখ ফেরাতে গিয়ে, ঘাড়ে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে, কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকিয়ে, একটু হেসে উঠলো। কমল ওর সেই বিশিষ্ট নিচু ঘরে বললো, ‘তোমার ছেলেমাঝুরি? আমি বোধ হয় অনুমান করতে পারছি।’

এবার ভুক কুঁচকে উঠলো ফুলরার। কমলের বেঁকে ওঠা ভুকের কোণ ঠুলির আড়ালে হারিয়ে গেল। হাসিটা ছড়িয়ে পড়লো ওর ঘন কালো গোফদাড়ির ভাজে। ফুলরা যেন স্পষ্ট দেখতে পেলো, কালো ঠুলির ভিতরে কমলের কৌতুকের ছটায় হাসি উজ্জ্বল চোখ ছটো। ফুলরা লজ্জার সঙ্গে একটু অস্বস্তি ও বোধ করলো। কি অনুমান করতে

পারছে কমল ? ফুলরা যে শকে কলেজে প্রথম দিকে চালাক আৱ
অহংকাৰী ভাবতো, সেটোই অনুমান কৰছে নাকি ? কিন্তু ফুলরা ওৱ
সে-মনোভাবেৰ কথা কোনোদিনই কমলকে বলেনি। সে-মনোভাব
ওৱ ততো দিন ছিল, যতো দিন কমলেৰ সঙ্গে পৰিচয় হয়নি। পৰিচয়েৰ
পৰে ওৱ মনোভাব বদলিয়ে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস কৰলো, ‘কৌ অনুমান
কৰতে পাৰছো, শুনি ?’

কমলেৰ দাতেৰ ঘিলিক দেখা গেল। গোফ দাঢ়ি থাকা সত্ত্বেও
ওৱ পুৱানো মুখটা মনে পড়ছে। সেই হষ্টু হষ্টু মতলবী হাসি। কমল
বললো, ‘বোধ হয় কবিৰ কথা মনে পড়েছিল !’

‘কে কৰিব ?’ ফুলৱাৰ অৰুটি চোখেৰ অগ্নমনস্কতায় দ্রুত স্মৃতি
হাতড়ানোৰ আলো-ছায়াৰ ধন্দ। কয়েক সেকেণ্ড পৰেই ওৱ দু চোখ
ঝলকিয়ে উঠলো এবং অবাক লজ্জায় হেসে উঠে বললো, ‘ঘাহ ! কৌ
বলছে ?’

কমল শব্দ কৰে হা-হা স্ববে হেসে উঠলো, আবাৰ তৎক্ষণাৎ নিজেকে
সামৰ্লিয়ে নিল। কিন্তু সামনেৰ আসনগুলো থেকে কেউ কেউ ওদেৱ
দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলো। সেই আসনেৰ তিন জনেই, দু দিকে দুই
অল্পবয়সী পুৱৰ্ষ, মাৰাখানে বিৱাটি খোপাব মহিলা। পিছন থেকে তখনই
শোনা গেল, ছড়া কাটাৰ স্বৰে, ‘দিনে দিনে বাড়ে আদৱি বাপ মায়েৰ
আদৱে/চান্দেৰ জোছনা য্যান্ উছ্‌লায় গাঙেৰে/ভৱা গাঙেৰ চেউ যেমন
অঈতে অধৱা/আ’লো। ওই আদৱি তুই পীন পয়োধৱা !’...

‘নো, নো মোৰ আদৱি ফোকস্ !’ অগ্ন স্বৰ বাধা দিয়ে বলে উঠলো,
‘স্টপ স্বুকুমাৰ !’

সম্ভবত স্বুকুমাৰেৰ গলাই শোনা যায়, ‘হোয়াই স্টপ !’ আমি কি
খাৰাপ কিছু বলেছি। দিস্ ইজ্ সিমপ্লি ফোক লোৱ অব— !’

‘নো দিস ফোক লোৱ !’ অগ্ন স্বৰ বলে উঠলো।

সম্ভবত স্বুকুমাৰেৰ গলাই শোনা গেল, ‘তা হলে ওয়াটাৰ বোটলটা
আমাকে একবাৰ দাও। কোলাঘাটি থেকে নতুন জল ভৱা হয়েছে,

থড়গপুর পার হতে চলেছে, আমাকে আর একবারও দেওয়া
হয়নি।’

অন্য স্বর, ‘দেওয়া হবে। তুমি অনেক জল টেনেছ, বেশি খেলে
উঠে যাবে।’

আব এক অন্য স্বরে হাসিব সঙ্গে, ‘ঁয়া, বাচ্চাদেব দেখিস না, ছুখ
হজম না হলে মুখ দিয়ে দই উঠে ?’

‘আমাৰ ইথে উঠে বাইনচোত্ৰ, শালা তো—।’

তো পর্যন্ত শুকুমাৰেব মুখেই সন্তুষ্ট শক্ত হাত চাপা পড়লো।
শুদিকে চাপা পড়তেই, ফল্লনা ঠিক ওৱ পিছনেটি নিচ স্বব শুনতে পেলো
‘কৌ অডাসিটি দেখেছেন ? খোঁজ নিয়ে দেখন, এবাই হযতো পঁচ দশটা
পাশ কনা শিক্ষিণ যুবক !’

অন্য নিচু স্বর, ‘এদেব পাশ কৰাকে আপনি শিক্ষণ বলেন ? এৱা
শিক্ষিত ? কহলেৰ সব টকে মেবেছে। আমি এদেব শিক্ষিত সন্তি
না, এবা তাৰ বলিদ পার্মা ?’

‘কিন্তু কলিকালে তো মশাই বলি উঠে যায়নি।’ প্রথম নিচু
স্বব, ‘এদেব আপনি বলি দিতে পাববেন না, তা হলে মানুষ খুনেৰ দায়ে
পড়বেন।’

অন্য নিচু স্বব, ‘এসব সহ কৰাব থেকে খুনেৰ দায়ে পড়ে ফাঁসি
যাওয়াও ভালো, তবু এসব আৱ সহ কৰা যায় না।’

প্রথম নিচু স্বব, ‘না মশাই, আমি আবাৱ এতোটা বলাটো চাই না।
এদেৱ এই সব বাঁদবামিৰ থেকে, এদেশে আৱো অনেক অসহ ব্যাপাৱ
ঘটছে। বলি দিয়ে ফাঁসিই যদি যেতে তয়, তা হলে আগে আৱো
অনেককে বলি দিতে হয়। আৱে মশাই, আপনি আমাৱ গুপৰ রেগে
গেলেন নাকি ? কৌ মুশকিল শুনুন—।’

॥ আট ॥

আব কিছুই শোনা গেল না। ফুলবাব ভৌধণ কৌচুহল হলো, পিছন ফিরে তাকিয়ে, এই মুহূর্তে এবাব দুই ভজলোককে দেখে নেয়। কিন্তু লজ্জা কবলো। তা ঢাঢ়া পিছনে ‘আদাৰ ফোকলোৱ’-এৱ গ্ৰুপটাৰ আছে। ওদেৱ কথায় স্পষ্টত বোৱা গিয়েছে, খুঁটার বোটলে কোলাঘাট থেকে নতুন কবে মৰ চ...। ইয়েতে, ফুলবা একবাৰ কুমাৰেৰ দিকে তাকালো। কুমাৰ মুখ নিচু কৰে বই পড়্যে। ফুলবাৰ সম্পর্কে মে রৌতিমতো উদাসীন। এই হচ্ছে ছেলেদেৱ চাৰত। ওদেৱ যেন বয়স হয় না। ষে-মুহূৰ্তে দেখলো, বিষয়টি নিফেন অগম্য, অস্পষ্ট, আব তাৰ সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি ছেলে, অমান চোহাৰা বদলিয়ে যাবে। অথচ বলবাৰ সময়ে বলবে, মেমেৰা সৈৰাকাৎ। কুমাৰদাৰ উদাসীনতা, আৱ গভীৰ মনোযোগ দিয়ে ম্যাগাজিন পড়া দেখে, ফুলবা মনে মনে আৱ এক চোট হেসে নিল। ও দেখলো একবাৰ দিদিৰ দিকে। অনুও ওৱ দিকেই একবাৰ তাকালো, তাৱপৰে কমলোৱ দিকে। বুবাই এখন জানালা দিয়ে বাইৱেৰ দিকে তাকিয়ে দেখছে। কুমাৰদাৰ ভাবনা থেকেই, ফুলবাৰ মনে হলো, একই মনোভাৱ থেকে কমল কবিৰ কথা হয়তো বলছে।

‘আমাৰ হাসিটা বৰাবৰই বিচ্ছিৱি।’ কমল বললো, ‘কিছু মনে কৱো না।’

ফুলবা বললো, ‘তোমাৰ হাসিটা আমাৰ কখনো বিচ্ছিৱি মনে হয়নি। লোকে ফিরে তাকিয়ে দেখলো আৱ কৌ কৱাৰ আছে? কিন্তু আমাৰ ছেলেমাঞ্চলি ভাবনা যে কবিকে মনে কৱে, তা অনুমান কৱলো কেমন কৱে?’

কমল ফুলরার দিকে তাকালো। কমলের মুখের হাসিটা এখন কিঞ্চিৎ দ্বিধান্বিত। ওর ঠুলির দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা। বললো, ‘তোমার কথাবার্তা শুনে’ মনে হতো, ব্যাপারটা তোমার কাছে ছেলেমানুষি মনে হয়েছিল।’

ফুলবা ঠোট টিপে হাসলো, বললো, ‘তখন যা মনে করেছিলে, তা হয়তো না-ও হতে পাবে।’

কমল তাড়াতাড়ি বললো, ‘ওহ্ নিশ্চয়! না-ও হতে পাবে। তা হলেও আমার অসুমানই যে সত্যি নয়, তা বলতে পাবো না। তয়তো তুমি বিমানের কথাই ভাবছিলে।

ফুলরার মনে মনে খুব হাসি পেলো। কিন্তু ও হাসলো না। কিছুক্ষণ আগে বিমানের কথা ওর মনে পড়েছিল, বাসে উঠে, প্রথম দিকে। তখন সত্যি সত্যি পুরনো দিনের কথা মনে পড়েছিল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির দিনগুলোর কথা।

ফুলরাকে চুপ করে থাকতে দেখে কমল ওর দিকে তাকিয়েছিল। ফুলরা একটু বোধহয় অন্যমনক্ষ হয়ে পড়েছিল। ও কমলের দিকে ফিরে তাকালো। কমলও তখনই মুখ ফিরিয়ে সামনের দিকে তাকালো। কিন্তু ফুলরার মনে হলো, ঠুলির আড়ালে কমল চোখের কোণ দিয়ে যেন ওর দিকেই তাকিয়ে রয়েছে। যদিও কমলকে এরকম ভাবতে অসুবিধা হয়। চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে দেখবার ছেলে ও কখনোই ছিল না। তবু কেন হলো? কমল মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য? কমল কৌ একটু গম্ভীর হয়ে গেল?

ফুলরা জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি কি মন খারাপ করলে নাকি?’

কমল ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। আবার ওর বাঁকা ভুক্ত খোঁচার মতো জেগে উঠলো ঠুলির বাইরে। অবাক স্বরে বললো, ‘মন খারাপ?’ তারপরেই একটু যেন বিষণ্ণ হেসে বললো, ‘তা বলতে পাবো। আমার চোখের সামনে সেই দিনগুলো ভেসে উঠছে, যে দিনগুলো আর কখনই ফিরে আসবে না। তাই না? আমরা যাই

করি না কেন, যে-পথেই চলি, পুরনো দিনগুলোকে ভোলা যায় না বিশেষ করে সেই সব দিনগুলো, দায়দায়িত্বহীন, খেলে, গল্ল করে আড়া দিয়ে বেড়ানো। অনেকটা আলবেয়ার কামুর সেই কথার মতো, শ্রোতস্বিনৌ জলের ধারায় স্নান এবং ষ্টেডসিক্ত রমণীর সান্ধিয় ।’ কমল একটু হাসলো, বললো, ‘সে হিসাবে বলতে পারো, মনটা কেমন কেমন করছে ।’

কমল এমনভাবে বললো, ফুল্লরার হাসি পেয়ে গেল। বললো, ‘বেশ বললে, মনটা কেমন কেমন করছে। কিন্তু সত্যি বলছি, বিমানের কথা আমার মনে পড়ছিল না। আগে অনেক ছেলেমানুষিই তো করেছি। সে সব কথাও মনে পড়ছিল ।’

কমলের ভুক তেমনি ঠুলির ওপরে জেগে আছে। ওর চোখে কৌতুহল আর জিজ্ঞাসা। বললো, ‘তবু, বিমানের কথা ভোলবার না ।’

‘ভুলিনি তো।’ ফুল্লরা বললো, ‘ভুলবো কেন? কবির সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। কিন্তু ও যে আদৌ কবি ছিল না, সেটাই আমার ছবি। কারণ ও আসলে—আসলে—।’ কথা শেষ না করে ফুল্লরা হেসে উঠলো।

কমল তেমনি ঠুলির বাইরে ভুক জাগিয়ে তাকিয়ে রইলো।

‘ওসব তো কামুর বয়স হয়ে যাওয়ার ছবিরের কথা।’ ফুল্লরা হেসে বললো, ‘তুমি নিশ্চয়ই সেই সাইলেন্ট মানুষ নয়?’

ঠুলির আড়ালে, কমলের চোখ দেখা যায় না। কিন্তু ঘন ফালো গোক দাঢ়ির মধ্যে ওর হাসিটা যেন কিঞ্চিৎ বিশেষ দেখাচ্ছে। বললো, ‘ত সাইলেন্ট ম্যান! না, সে হিসাবে বয়স বেড়ে যাবার ছবি আমি কিছু বলছি না। কিন্তু পুরনো দিনগুলো কি ভোলা যায়? আমি তো পারি না। সে সব দিন যে আর ফিরে আসবে না, কোনো সন্দেহ নেই, তাই না! মনটা একটু খারাপ হয় বই কি। তোমার হয় না? কিন্তু ভালোও লাগে।’

ফুল্লরার ভুক ছটো কুঁচকে উঠলো, এক মুহূর্তের জন্য অঙ্গমনক্ষ

দেখালো ওকে। একটু বা অবাকও। কমলের কাছ থেকে যেন এরকম কথা আশা করেনি। পুরো দিনের জন্য মন খাবাপ, আর যাবাই হোক, কমলের কেন হবে? কমলের বর্তমান ব্যাকগ্রাউণ্ড তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওর সব কিছুই হলো পজেটিভ। অস্তুত হওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে কিছু বলতে বা জিজ্ঞেস করতে, ফুল্লরার সংকোচ হলো। ওব ভাবনাটা যথার্থ নাও হতে পারে। তা ছাড়া, এখনকার এই কমল ওর কাছে কিছুটা রহস্যময়, অচেনা, আবছা, এবং একটা অস্পষ্ট ভয়ও আছে। ও হেসে বললো, ‘আমাৰ এমনিতে থারাপ লাগে না—পুৱনো দিনেৰ কথা ম’ন হলে, তবে ভালো লাগে, তুমি যা বললো। কিন্তু তুমি কি কামুব লেখা এখনো পড়ো নাকি?’ ফুল্লরার চোখে কৌতুকের ছটা।

কমল মাথা মাড়িয়ে, সামনেৰ দিকে তাকিয়ে বললো, ‘না, যা পড়বাৰ তা আগেই পড়েছি।’

‘কিন্তু শ্রোতৃস্থিতি জলেৰ ধাৰায় স্নান আৱ স্বেদসিক্ত রমণীদেৱ কথা বোধহয় লেখা ছিল না।’ ফুল্লো হাসতে গিয়ে, ঠোটেৰ গুপৰ আলত্তো কৰে বাঁ হাত তুলে চাপা দিল, এবং ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখেৰ তারায় বিলিক হেনে আবাৰ বললো, ‘স্নান আৱ স্বেদসিক্ত রমণী সামিধ। দাকণ! কামুব নামে, কথাগুলো তোমাৰ নিজেৰ মনে হচ্ছে।’

কমল চুল দাঢ়িতে বাপটা দিয়ে, বাঁ দিকে ফিরে তাকালো। ঠুলিব বাটিবে ওৱ মোটা ভুৱ আবাৰ খোচা হয়ে উঠলো। ওৱ সেই বিশিষ্ট স্বরে অবাক হয়ে বললো, ‘তাই নাকি? আশ্চর্যই তো! তা হলে কথাগুলো আমাৰ মনে কোথা থেকে এলো?

‘বোধ হয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে?’ ফুল্লোৰ চোখে মুখে ঝুক্ত হাসিৰ ছাতি।

কমলেৰ কালো গোফ দাঢ়িও যেন লাল হয়ে উঠলো, বললো, ‘অ্যাবসার্ড।’ বলেই অন্তমনক্ষ আৱ চিন্তিত হয়ে উঠলো। মুখ তুলে সামনেৰ দিকে তাকালো, আবাৰ বাঁ দিকে ফিরে বললো, বোধহয় অন্ত

কোনো কিছুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি, কারোর কবিতা-টিবিতাৰ
সঙ্গে।'

ফুল্লুৱাৰ মনে পড়লো পূৰনো দিনেৰই কথা, কমলেৰ সেই কয়েক
শহুৰ আগেৰ মুখ। কোনো কাৰণে বিৰত বা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লৈছি,
ওৱ মুখ লাজ হয়ে উঠলো। আৱ তা কাটাবাৰ জন্ম ওৱ
জজ্ঞত চেষ্টা সহজেই ধৰা পড়ে যেত। এখন যেমন পড়ে যাচ্ছে।
কমলেৰ অনেক দিনেৰ অদৰ্শন, আবছা অচেনা ছায়াটা যেন, অনেক-
থাণি কেটে গোল। সেই চেনা কমলকে দেখা যাচ্ছে। যে-কাৰণে
ফুল্লুৱা ইচ্ছা হলো, কমলকে আবো একটু চেপে ধৰতে। ও বললো,
'তুলয়ে যাবাৰ কী আছে। অ্যাবসার্ডই বা কেন বলছো ? নিজেৰ
অভিজ্ঞতা থেকেই শ্ৰোতৰে জলে স্নান আৱ ষ্টেডিস্কুল রমণীদেৰ কথা
মনে গলে, ক্ষতি কী ?'

কমল কয়েক মুহূৰ্ত ফুল্লুৱাৰ দিকে তাকিয়ে রইলো। আস্তে আস্তে
ওৱ চোখেৰ ঢুলিৰ কাচে যেন কৌতুকেৰ ঝিলিক লাগলো, আৱ মুখে
তড়িয়ে পড়লো হাসি। বললো, 'না, কোনো ক্ষতি নেই।'

বলে সামনেৰ দিকে তাকালো। ফুল্লুৱা চোখেৰ অনুসন্ধিৎসা
তীব্ৰ হলো। কমলেৰ এই ছোট জ্বাবে, কিছুই বোঝা গেল না।
ও কী বলতে চাইলো ? ফুল্লুৱা কিছু জিজ্ঞেস কৰিবাৰ আগেই, কমল
আস্তে আস্তে আবাৰ ওৱ দিকে ফিরে তাকালো। মুখেৰ হাসিটা
আৱো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে, বললো, 'অভিজ্ঞতা একেবাৱে নেই, তা বলা
যায় না। বাৱাসতেৰ সেই পুকুৱেৰ জলে স্নান কৰতে গিয়ে অৱগা
একবাৰ ডুবতে বসেছিল। পুকুৱেৰ জল শ্ৰোতৰিনী নয় বটে, তবে
সকালেৰ রোদে বেশ চিকচিক কৰছিল। আৱ তুমি তখন সাতাৰ
কেটে অনেক দূৰেৰ জলে চলে গেছলো।'

কমলেৰ কথা শ্ৰেষ্ঠ হবাৰ আগেই, ফুল্লুৱা জুকুটি চোখে হাসি
চলকিয়ে উঠলো, এবং শ্ৰেষ্ঠ পর্যন্ত খিলখিল কৰে হেসে উঠলো। বলে
উঠলো, 'ওহু কম— !'

‘হরিপদ’ কমল বেশ শব্দ করে বলে উঠলো। যেন ফুল্লরার
স্বর ডুবে যায়।

ফুল্লরা তৎক্ষণাত মুখে হাত চাপা দিয়ে, উর্ধ্বগ চোখে সামনে ডাইমে
তাকালো, বললো, ‘সরি, একটুও মনে ছিল না হরি—ইয়ে তেরো
তেরো।’

বলেই আবার খুর হাসি পেয়ে গেল, আবার মুখে হাত চাপা দিল।
আর নিজের অপ্রতিরোধ্য উদ্বাম হাসি গোপন করার জন্য বঁ দিকে
জানালার ওপর ঝুঁকে পড়লো। ইতিমধ্যেই যাত্রীরা কেউ কেউ
ওদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। কমলের মুখে হাসি। সে সামনের
দিকে তাকিয়ে ছিল। ফুল্লরার চোখে মুখে বাতাসের ঝাপটায় চুল
ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। ভাবলো, এষ হচ্ছে আসল কমল। শান্ত মুখে
মিটিমিটি হেসে একটা সৌরিয়স বাপারকে এক মুহূর্তে হাস্তকব করে
তোলা।

ଫୁଲ୍ଲରାର ଚୋଥେର ସାମନେ ସାତାରେର ମେହି ଛବି ଭେଦେ ଉଠିଲୋ । କମଳେର ଉଂସାହେଇ ପ୍ଲାନ କରେ ବାରାସତେ ସାତାର କାଟିତେ ଯାଉୟା ହେୟେଛିଲ । ବାରାସତେ ହିମାଜିଦେର ଏକଟା ବାଗାନବାଡ଼ି ଛିଲ । ଅନେକ ଫଲେର ଗାଛ ଆର କିଛୁ ଚାଷଆବାଦ । ଏକଟା ଛୋଟ ପୁକୁର ଆର ଏକଟା ବଡ଼ । ବଡ଼ ପୁକୁରଟାକେ ଏକଟା ଦୀଘିଟି ବଲା ଧାଯ ।

ହିମାଜି କମଳଦେର କନଟେମପୋରାବି, ଫୁଲ୍ଲରାର ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଧୁତ ଛିଲ । କମଳ ତାର ଆଗେ, ହିମାଜିଦେର ବାରାସତେର ବାଗାନେ କମେକବାର ଗିଯେଛିଲ । ଏକବାର ଦଳ ବୈଧେ । ଭୋରବେଳୋ କଲକାତା ଥିକେ ବାରାସତେ ଗିଯେ ପୁକୁରେ ସାତାର କାଟାର ପ୍ଲାନଟା କମଳେରଇ ଛିଲ । କମଳ ସାତାବ ଶିଖେ ଛିଲ ଶୁଇମିଂ କ୍ଲାବେ । ଛେଲେବେଳୋ ଏକ ସମୟେ ନାକି ଓର ସାତାର ହବାର ଝୋକ ହେୟେଛିଲ । କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗେ, ଫୁଲ୍ଲରା ଅନେକବାରଇ ଠୋଟ ଉଲ୍ଟିଯେ ବଲେଛେ, ‘ଲେକେର ଜଳେ ଆର ହେଦୋର ପୁକୁରେ ସାତାର ଶେଖା ଆବାର ସାତାର ଶେଖା ନାକି ? ସାତାର କେଟେ ଗଞ୍ଜା ପେରୋତେ ପାରୋ ?’

କମଳ ବଲତୋ, ‘ଅନାୟାସେ, ତବେ ଏକଟୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ହତେ ପାରେ —ମାନେ ସଙ୍ଗେ ଏକଜନ ଥାକଲେ ମୁବିଧେ ହୟ ।’ ଫୁଲ୍ଲରା ହାସତୋ । ଅବିଶ୍ଵି ଏକ କଥାଯ୍ୟ, ଝାପିଯେ ପଡ଼େ, କଲକାତାର ଗଞ୍ଜା ଓର ପକ୍ଷେ ପାର ହୋଇଯାଓ ହୁଅତୋ ସମ୍ଭବ ଛିଲ ନା । କିନ୍ତୁ ଓର ସାତାର ଶେଖା ନଦୀତେଇ ଶ୍ରୋତସ୍ଥିନୀ ନଦୀ ଯାକେ ବଲେ, ଉତ୍ତରବଦ୍ରେର ପ୍ରବଳ ଧାରାଯ ଯେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ । ବର୍ଷାକାଳେ ସମୁଦ୍ରେ ମତୋ ବିଶାଳ ସାଇରେଓ ସାତାର କାଟାର ଅଭିଭିତା ଓର ଛିଲ । ଅତଏବ ଓର କାହେ କଲକାତାର ଲେକ ପୁକୁର ଆର ଶୁଇମିଂ ପୁଲ, ସବଇ ଏକଟା ଅକିଞ୍ଚିକର ମନେ ହତୋ । ଓଥାନେ ସାତାର କେଟେ ଯେ ସାତାର

শেখা যায়, আদৌ ওর বিশ্বাস হতো না। সাঁতার শেখার একটা বিলাস মনে হতো।

হিমাঞ্জিদের বারাসতের বাগানে যাবার উৎসাহটা কমলের সেইজগ্যাই বিশেষ ভাবে ছিল। ‘তোমার সাঁতার একদিন দেখতে হবে।’ কমল প্রায়ই বলতো।

‘কিন্তু তোমাদের ওইসব স্বাইমিং পুলে আমি সাঁতার কাটিবো না, ফুল্লরা বলতো।

‘কেটো না, তোমাকে নিয়ে যাবো মন্তবড় একটা নির্জন পুকুরে, পাড়াগাঁয়ে।’ কমলের এই কথার জবাবে ফুল্লরা বলেছিল, ‘তাহলে রাজী।’ হিমাঞ্জিও তৈরি ছিল। অরুণা—অরুণা ঘোষ তখন কমলকে ভীষণ ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। আর অরুণাকে হিমাঞ্জি। অরুণার ছিল ইতিহাসে অনার্স। অরুণার প্রসঙ্গ হিমাঞ্জি তুলেছিল। অরুণা প্রায়ই সাঁতারের কথা বলতো। সময়টা তখন বসন্তের শুরু, সকালের দিকে একটু শীত শীত ভাব। অরুণা স্বাইমিং কস্টুম নিয়ে গিয়েছিল। ফুল্লরার ছিল না। ও কোমরে শাড়ি জড়িয়েই জলে ঝাপ দিয়েছিল। ওরকম ভাবে সাঁতার কাটাতেই ও অভ্যন্তর ছিল। মাথার চুলে অবিশ্য শক্ত করে পাতলা গামছা বেঁধে নিতে হয়েছিল। ওর মাথার চুল তখন বেশ বড় ছিল। নিরিবিলি বাগানে, রোদ ঝলকানো দৌঘরি মতো পুকুরটা দেখে, ফুল্লরা খুশি হয়েছিল। কিন্তু অরুণা সব আনন্দ মাটি করে দিয়েছিল।

কমল ফুল্লরাকে অচুসরণ করেছিল। কিন্তু হিমাঞ্জি কমলের থেকে ভালো সাঁতার জানতো। ও ফুল্লরাকে অচুসরণ করার চেষ্টা করেনি, প্রতিষ্ঠিতায় নেমেছিল। ফুল্লরা হিমাঞ্জির কাছে হেরে গিয়েছিল। ফুল্লরা যেটা ওর নিজের সম্পর্কে খেয়াল করেনি, তা ওর শরীরের ওজন, ওজন আর অনভ্যাসে ফুরিয়ে যাওয়া দম। দেশ থেকে কলকাতায় এসে, প্রথমদিকে কিছুটা রোগ হলেও, পরে ওজন কিছু বাঢ়তে আরম্ভ করেছিল। সেটাকে মোটা বলা চলে না। সম্ভবত তারঝণ্যের ধারের

সঙ্গে কিছু কিঞ্চিৎ ভারও থাড়ে। সাঁতার কাটা অভ্যাস ছিল না অনেক দিন। আর সাঁতার কাটা এমন একটা খেলা, চৰ্চা ন! থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়।

পিছন থেকে একটা আর্তনাদের পরেই, কমলের চিংকার প্রথম শোনা গিয়েছিল, ‘অরুণা ! অকণা ডুবে যাচ্ছে !’ ফুলরা আর হিমাঞ্জি দু’জনেই ঘাটের দিকে ফিরেছিল। অকণা ঘাট থেকে বেশিদূর আসেনি, সন্তুষ্ট ওর পায়ের তলার সিঁড়ি হারিয়ে গিয়েছিল। সাঁতার জানলে সেখানে ডুবে যাবার কোনো কাবণ ছিল না। ফুলরা আব হিমাঞ্জি তৎক্ষণাত্মে ঘাটের দিকে সাঁতাৰ দিয়েছিল। কিন্তু দু’জনেই তখন কিছুটা ঝাস্ত। সেই তুলনায় কমল বেশিদূর আসেনি, সেও ঘাটের দিকেই ফিরতে আরস্ত করেছিল। অকণা তখন রৌতিমতো হাবুড়ুবু খাচ্ছিল। ফুলরার মনে আছে, বিহুচকিতে ওর মস্তিষ্কে একটা আতঙ্কিত চিন্তা বিলিক দিয়ে উঠেছিল, কমল যদি অকণার কাছে যায়। আর অরুণা কোনো রকমে ওকে জড়িয়ে ধরতে পারে, তা হলে একটা বিক্রী সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। তাৰাশঙ্কুৰের তাৰিণী মাঝি গল্পটা তখন ওর মনে পড়েছিল। একমাত্র রক্ষে, কমলের সাঁতারে তেমন গতি ছিল না, ও পা দাপাঞ্চিল অনেক বেশি। সেই তুলনায় হিমাঞ্জি ছিল অনেক বেশি ঝুক্তগামী। কিন্তু সেই বিপদের মুহূর্তে, ফুলরা কোথা থেকে শক্তি পেয়েছিল, কে জানে ? ও হিমাঞ্জিকে অতিক্রম করে, তাঁৰের বেগে অরুণার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। অরুণার টুপি জড়ানো মাথাটা তখন একটু একটু দেখা যাচ্ছিল, আর ঝাস্ত ছুঁড়ে দেওয়া হাত। কমল অরুণাকে ধৰবার আগেই, ফুলরা ঝুক্তস্থৰে বলে উঠেছিল, ‘ছেড়ে দাও, তুমি সিঁড়িতে ওঠো !’ বলেই অকণাৰ একটি হাত পিছন থেকে টেনে ধৰে, আগ্রাগ শক্তিতে ঘাটের দিকে টেনে নিয়েছিল। ফুলরা জানতো, সামনে থেকে ধৰলে, অরুণা ওকে জড়িয়ে ধৰবে। ইতিমধ্যে হিমাঞ্জি এসে পড়েছিল। ফুলরা বলেছিল, ‘আমি ওকে ঠিক ধৰেছি, তুমি আমাৰ হাত ধৰে, ঘাটেৰ সিঁড়িতে টেনে নাও !’

ব্যাপারটা একদিক থেকে ঘটেছিল হরিষে বিষাদ। অরুণাকে জল থেকে তুলে আনার পরে, হিমাদ্রি ডাক্তার ডেকে এনেছিল। পেটে কিছু জল যাওয়া ছাড়া লাঙ্সে কিছু হয়নি। অচৈতন্য হয়েছিল খুব সামান্য সময়ের জন্য। অরুণা যে একেবারেই সাঁতার জানতো না, তা না। কিন্তু দীর্ঘির কালো জল, পিছল সিঁড়ি ওর মনে ভয় দুকিয়ে দিয়েছিল, আর জলের নিচে সিঁড়িতে পা পিছলে মাটির নাগাল না পেয়ে, ভয় পেয়েই ও ডুবতে বসেছিল। প্রোগ্রাম অনুযায়ী বারাসতের বাগান-বাড়িতে হপুরে থেয়ে ওরা ফিরেছিল। হিমাদ্রি প্রায় সব সময়েই অরুণার কাছে বসেছিল। হরিষে বিষাদটা পরে বিষাদে হরিষ হয়েছিল। সেই ঘটনার পর থেকেই, অরুণা হিমাদ্রির টান্টা সঠিক অনুভব করেছিল।

ফুল্লরার স্মৃতি থেকে হাসিটা আবার উদ্বাম হয়ে উঠতে চাইলো। ও জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালা। কমলের মুখ সামনের দিকে ছিল। ফুল্লরা মুখ ফেরাতেই সে ফিরে তাকালো। ফুল্লরা বললো, ‘অন্তুত তুমি। কোন্ কথা থেকে কোথায় চলে গেলে?’

‘কৌ করবো বলো।’ কমল নিচু স্বরে বললো, ‘রমণীর স্নান বলতে সেই দৃশ্যই আমার অভিজ্ঞতা। অবিশ্ব তার পরের ব্যাপারটা—’ কমল থেমে গেল।

ফুল্লরা ভুঁক কোচকালো। কমল একটু হেসে বললো, ‘কিন্তু স্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা—বিশ্বাস করো, বই ছাড়া আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।’

‘মিথ্যে কথা।’ ফুল্লরা দাঢ়ে ঝটকা দিয়ে বলে উঠলো, ‘কমল, সত্য নয়।’

কমলের কালো টুলির উপরে আবার ভুঁক র্ধোচা দিয়ে উঠলো। পরমুহূর্তেই হেসে উঠলো। বাঁ দিকে ঝৈষণ ঝুঁকে খুবই নিচু স্বরে বললো, ‘তাহলে কল্পাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পারি।’

কমল কথাটা উচ্চারণ মাত্র, ফুল্লরার মুখে লাল ঝলক লেগে গেল। মুখ ধূলে কিছু বলতে গিয়েও ওর গলায় কোনো কথা ফুটলো না। কমলের ঝকঝকে কালো টুলির দিক থেকে ওর মুখ ফিরিয়ে বিল্প।

একটা চিকির শেনা গেল, ‘বাহারাগোরা।’ মাঝখানে পিচ
ঁধানো অনেকখানি খোলা জায়গা প্রায় গোলাকার। তাকে ঘিরে
বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন দিকে চলে গিয়েছে। বাসটা ঝাঁকুনি দিয়ে, বাঁ দিকে
মোড় নিয়ে, গর্জন থামালো।

‘পুরীর বাস্তা।’ পিছন থেকে কেউ বললো, ফুল্লরা শুনতে
পেলো।

ইতিমধ্যে থঙ্গাপুর চকে বাস একবার দাঢ়িয়েছিল। ফুল্লরা কমলের
সঙ্গে কথার ব্যস্ততার মধ্যে লক্ষ্য করেছিল। ও নামেনি, কমলও না।
দিদি বুবাই নামে নি। কুমারদা নেমেছিল, খেয়াল ছিল, কখন উঠেছিল,
দেখেনি। কমল হঠাত কপাদের বাড়ির প্রসঙ্গ তুলতেই ওর মনটা চলে
গিয়েছিল, একদিন এক আলো-ঝলমলে ছল্লোড়ের রাত্রে। আলো-
ঝলমলে ঠিক বলা যায় না, বরং স্বপ্নালোকে। আলো-ছায়ার এক
শৈলিক পরিবেশ। কপার—কুপা রায়েব জন্মদিনের উৎসব ছিল। কুপা
ছিল ফুল্লরার সম-ঞ্চৌর। এবং ইংরেজিতে ওরও অনাস ছিল। গাড়িটা
ঝাঁকুনি দিয়ে দাঢ়াতেই, ফুল্লরার চোখ পড়লো বাহারাগোরার প্রাণ্টরে,
যন থেকে আবছা হয়ে গেল কপাদের বাড়ির সেই রাত। বাঁ চোখের
ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া চুলের গোছা সরিয়ে, ও ডান দিকে তাকালো।

অনু বুবাইয়ের হাত ধরে উঠে দাঢ়িয়েছে। কুমারও উঠে দাঢ়ালো।
অনুর সঙ্গে ফুল্লরার দৃষ্টি বিনিময় হলো। অনুর চোখে অনুসর্কিংসা, সে
কমলের দিকে চোখ ফেরালো। তার চোখের জিজ্ঞাসাটা স্পষ্ট পড়া
যায়। স্বাভাবিক, কমলের পরিচয় জানার ঔৎসুক্য বা কৌতুহল দিদির

মনে জাগতেই পারে। প্রথামতে, দিদি আর কুমারদার সঙ্গে কমলের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও উচিত। কিন্তু উপায় আছে কী? ও জিজ্ঞেস করলো, ‘দিদি, তুমি নামছো?’

অনু বললো, ‘হ্যাঁ, বুবাইয়ের বাথরুম পেয়েছে।’

ফুলরা বুবাইয়ের দিকে দেখলো। বুবাই ঝষ্ট মুখে ঠোটে ঠোট টিপে, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা তুলে, ফুলরাকে কয়েকবার দেখিয়ে দিল, তারপরে মায়ের হাত ছাড়িয়ে, ওর বাবার পাশ দিয়ে জোর করে পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ফুলরার মস্তিষ্কে তখনো ঝুপাদের বাড়ির ঝাপসা ছবি, যেখান থেকে ও পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। বুবাইয়ের ঝষ্ট মুখে কড়ে আঙুল দেখানোর আকস্মিকতায় ও চমকিয়ে উঠলো, এবং হেসে উঠে, পিছন ‘ফবে জিজ্ঞেস করলো, ‘কেনেরে বুবাই, আড়ি দিচ্ছিস কেন?’

বুবাই তখন অদৃশ্য, ফুলরার চোখ পড়লো সেই তিন জনের ওপর, যাদের মধ্যে একজন আদরিব ফোক সঙ্গের গায়ক। তিন জনেরই চোখ লাল, তিন জনেই পিছনের দরজার দিকে ঘেতে গিয়ে, ফুলরার কথা শুনে, পেছন ফিরে তাকালো। একজন বললো, ‘তাড়াতাড়ি আয়, এখানে বেশিক্ষণ দাঢ়াবে না।’

ফুলরা তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, ওর পিছনের জোড়া আসনের জোড়া মুখ দু'টির সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিমিময় হয়ে গেল। দু'জনের বয়স ষাটের কাছাকাছি, দু'জনেই ফুলরার দিকে তাকিয়েছিলেন। উভয়ের চোখমুখের ভাবই বুবাইয়ের মতো ঝষ্ট, এবং এটা খুবই স্বাভাবিক, তথাপি ওর মনে চকিতের জন্মই জিজ্ঞাসা জেগে উঠলো, কেন? তখন পিছনের দরজার কাছ থেকে স্বর ভেসে এলো, ‘জোছনা করেছে আড়ি।’

অনুর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। কুমারকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এসে ফুলরাকে বললো, ‘নামবি নাকি? আয় না।’ বলেই পিছনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ফুল্লরা নামার কথা ভাবেনি, ও জিজ্ঞাসু চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমজ ইতিমধ্যে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। সে ঝুঁকে পড়ে নিচু শব্দে বললো, ‘আমি এখানে আর নামবো না, বরং গাড়ির তে তরটা একবার ক্লুটনি করে দেখে নিই।’

ফুল্লরা ঠিক এই কাবণে কমলের দিকে তাকায়নি। ও যে-কারণে জিজ্ঞাসু, সেটা একান্তই ওর মনের জিজ্ঞাসা। দিদির ডাক এতোই সহজ আব সরল, তার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। নিচে নামলেই দিদি কমলের পরিচয় জানতে চাইবে। অবিশ্বিত তার জবাবটা কমলের কাছ থেকে জানবার কোনো দরকার নেই। ফুল্লরা নিজের মনেই একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠে দাঢ়ালো। কমল তৎক্ষণাতঃ উঠে, সবে গিয়ে ওকে বেরোবার রাস্তা দিল। ফুল্লরা দেখলো, কুমার তখন দাঁড়িয়ে। ও সামনের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কুমার গেল পিছনে দরজার দিকে।

বাস থেকে নামতেই ফুল্লরার মনে হলো, রোদ যেন অঙ্গারের মতো জলজল করছে। কুপাদের বাড়ির সেই রাত ।...মন্ত্রিকের দূর সীমায়, অস্পষ্ট সাক্ষেত্রিক শব্দের মতো, কথাটা এখনো বাজছে। বাতাসটা কী সাংঘাতিক গরম! আগনের হলকার মতো। একেই বোধহয় শু বলে। এ জায়গাটা ঠিক কোনো শহর বা জনপদ নয়। একদিকের রাস্তায় অনেকগুলো ভারী আর ভরতি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি। পাশে রাস্তার ধারে একটা বড় ঘোপড়ি, সেখান থেকে উনোনের ধোঁয়া উঠছে। পুরীর বাসটা যেখানে দাঢ়ালো, তার ধারে কয়েকটা ছেট চা জলখাবারের দোকান, এখনেও সেই গরম সিঙাড়ার চিংকার, গরম চায়ের ডাক। সবই গরম, আকাশটাও জলছে।

অনু ফুল্লরার কাছে এগিয়ে এসেই, অথবে জিজ্ঞেস করলো, ‘ফুলি, ওই লোকটা তোর চেনা নাকি? কী করে আলাপ হলো?’

ফুল্লরা হেসে উঠলো। ওর পিছনের ছায়াটা যে কুমারদার, তা টের পেলো। বললো, ‘লোকটা কী বলছো দিদি? কলেজে আর

ইউনিভারসিটিতে ও আমার থেকে এক বছরের সীমিয়ার ছিল। আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

'ওমা, তাই নাকি?' অনু সরল বিশ্বয়ে হেসে বললো, ফুল্লরার পিছন দিকে কুমারের দিকে তাকালো। ফুল্লরা এবার পিছন ফিরে কুমারের দিকে দেখলো। কুমারের মুখ গন্তার, সে সিগারেট টানছে। বললো, 'তা হলে গোফ-দাঢ়িওয়ালাকে দেখে, প্রথম থেকেই ওরকম চমকাবার ভণিতা করছিলে কেন? যেন চেনো না, খুবই ভয় পেয়ে গ্যাছো! আমাকে বললেই পারতে, তা হলে আর আমি তোমার বন্ধুকে তেরো নম্বরটা তোমাকে হেঢ়ে দেবার কথা বলতাম না।'

ফুল্লরা তুক্ক কুঁচকে, চোখ থেকে সান-গ্লাস খুলে, অবাক হয়ে বললো, 'এ কি বলছেন কুমারদা? আমি ওকে চিনতে পারলে আপনাকে বলতাম না।'

অনুও অবাক হয়ে গিয়ে হেসে বললো, 'তোব কুমারদার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে।'

কুমার রৌতিমতো অবৃক্ষ ক্ষুক্ষ বালকের মতো মুখ করে বললো, 'হ্যা, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে আর তোমাদের দুই বোনের মাথা খুব ভালো আছে।' বলে সরে যাবার উদ্ঘোগ করে, এক পা গিয়ে ধমকিয়ে দাঢ়িয়ে বললো, 'এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে, যাকে তুমি চিনতে পারিনি, তার সঙ্গেই হঠাতে ভাবে জমে গেলে।'

'ওহ কুমারদা, সত্যি বলছি ওর দাঢ়ি-গোফের জন্য আমি ওকে একদম চিনতে পারিনি।' ফুল্লরা প্রায় অসহায় বিশ্বয়ে বললো, 'আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন?'

কুমারের চোখে দ্রিধা আর বিশ্বয় ফুটে উঠলো, ঈষৎ বিব্রত হয়ে বললো, 'অবিশ্বাস কেন করবো!'

'কিন্তু তুমি তাই তো করছো।' অনু বললো, 'ফুলিকে তুমি ওরকম বলছো কেন? কথাটা শুনতে দাও না। আমিও তো এতক্ষণ ধরে ভৌবণ অবাক হচ্ছিলাম, আর মনে মনে ভাবছিলাম, তোমার কথাই

সত্ত্ব হয়ে গেলঃ নাকি ? ফুলির সঙ্গে পাশ্চাপাশি বসে লোকটার ভাব
হয়ে গেল ?’ অনু হাসলো ।

ফুলরা বললো, ‘ও নিজে থেকে না বললে, আমি ওকে কিছুতেই
চিনতে পারতাম না । তু’বছরের শুপর ওকে আমি চোখেই দেখিনি,
তার ওপরে শুইরকম চুল দাঢ়ি-গোফের বোঝা । ওর বাড়ির সোকেরা
দেখলেও বোধ হয় ওকে চিনতে পারবে না ।’

কুমারের মুখে একটু বিব্রত হাসি ফুটলো, বললো, ‘তবে আমাকেও
খুব দোষ দিতে পারো না । কিছুই জানি না, হঠাৎ দেখলাম, তোমরা
হ’জনে আচমকা বন্ধুর মতো কথা বলতে আরম্ভ করে দিলে, আর খুব
হাসাহাসি শুরু করে দিলে । আর তোমরা বেশ চাপা গলায় কথা
বলছিলে, একটা কথাও প্রায় শোনা যাচ্ছিল না ।’

ফুলরা হেসে বললো, ‘কেন, খুব তো আমার পেছনে লাগছিলেন ।
আমার সঙ্গে যদি কোনো ছেলের ভাবই হয়, তাতে আপনার কৌ ?’

কুমারের হাসিটা বিস্তৃত হলো, কিন্তু বিরুণও । অনু চোখ ঘূরিয়ে
বললো, ‘বাহু, শালী বলে কথা ! তায় আবার অভিভাবক । গায়ে
লাগবে না ? ছেলেরা সবাই এক ?’

ফুলরা জোরে হেসে উঠে, মুখে হাত চাপা দিল । চোখে চাপালো
সান-গ্লাস । বুবাই ওর হাফ-প্যাণ্টের নিচটা টেনে নামাতে নামতে
এগিয়ে এসে বললো, ‘ফুলিমাসী, হাসে আর যাই করো, তোমার সঙ্গে
আমার আড়ি ।’

‘কেন রে বুবাই ?’ ফুলরা হাত বাড়িয়ে বুবাইয়ের চিবুক ধরতে
গেল ।

বুবাই মুখ সরিয়ে বললো ‘তুমি আর এখন আমাদের কেউ নও,
তুমি ওই দাঢ়িওয়ালা লোকটার ।’

ফুলরার সঙ্গে অনুও শব্দ করে হেসে উঠলো । অনু বললো,
‘দেখলি তো, ছেলেরা সবাই এক ?’

‘সত্ত্ব !’ ফুলরা হাসি সামলাবার চেষ্টা করলো ।

‘বুবাই জুতো ঘষটে তু’পা সরে গিয়ে, তর্জনী নেড়ে নেড়ে বললো, ‘তা হোকগে ফুলিমাসী, আমি খুব রেগে গোছি ! আমি বাবা, আমি বাবা’ তোমার সঙ্গে মিশবো না, শষ্ঠি দাঢ়িওয়ালাটা—’

‘আহ বুবাটি, আস্তে !’ কুমার বলে উঠলো, এবং একবার বাসের দিকে ফিরে দেখে নিয়ে আবার বললো, ‘বাজে কথা বলো না । কিন্তু ফুলি—’ সে ফুলরার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি তোমার বন্ধুর নাম ধাম কিছুই তো বললে না ?’

অনু বললো, ‘তুই ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলি না তো ফুলি ? ও কি তোর সঙ্গে কখনো আমাদের বাড়ি গেছে ?’

ফুলরার মুখে বিব্রত আর অস্তিত্ব ভাব ফুটে উঠলো, ‘না, ও কখনো আমাদের বাড়ি যায়নি ।’ বলে এক মৃহূর্ত চুপ করে রইলো, চোখের কোণে একবার বাসের দিকে তাকালো, তারপরে বললো, ‘দিদি, পুরী গিয়ে, আমি তোমাদের বলবো, এখন ওর নাম-পরিচয়টা বলা যাবে না—মানে ইয়ে, একটু অন্ত ব্যাপার আছে । আমি তোমাদের সব বলবো, পরে । পুরী গিয়ে ।’

অনু আর কুমার নিজেদের মধ্যে অবাক দৃষ্টিবিনিময় করলো, চোখ ফিরিয়ে তাকাল ফুলরার দিকে । ফুলরার অস্তিত্ব বেড়ে উঠলো, বললো, ‘ও নিজেই ওর নাম ধরে ডাকতে আমাকেও বারণ করেছে । ওর নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো অস্তুবিধি আছে । তোমাদের বলতে আমার কোনো অস্তুবিধি নেই, আমি নিজেও ওর সব কথা জানি না, এত দিন ও কোথায় ছিল, কী করছিল । ওর কথা থেকে বুঝলাম, ও জানাতেও চায় না ।’

কুমার অপলক সন্দিগ্ধ চোখে ফুলরার দিকে তাকিয়েছিল । তার দিকে ফুলরার চোখে চোখ পড়তেই, ও কেমন অস্তিত্ব বোধ করলো, আর অগ্রস্তত্বাবে হাসলো । কুমার বললো ‘আমি বোধহয় বুঝতে পেরেছি ।’

ফুলরা আর অনুর চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠলো । কুমার ঠোট

টিপে হেসে বললো, ‘বোধহয় ঠিকই বুঝেছি, কিন্তু মে কথা আমি এখন
- বলতে চাই না।’ জে আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো।

অনুর চোখে কৌতুহল আৱ জিজ্ঞাসা তেমনই জেগে রইলো।
ফুলৱা খানিকটা নিষ্পৃহভাবে বললো, ‘মোটেৱ ওপৰ আমি বলতে
পাৰি, আমৱা একসঙ্গে পড়েছি, ওৱ সঙ্গে আমাৰ খুব ভাব ছিল—
মানে, বন্ধুত্ব। আমি নিশ্চয় কখনো কখনো বাড়িতে ওৱ নাম কৱেছি,
কিন্তু তোমৱা ওকে কখনো দেখনি বলে চিনতে পাৰবে না।’

‘তা না পাৱলেও ক্ষতি নই।’ কুমাৰ বললো, ‘তুমি ওৱ পাশে
বসে গল্প কৱছো কৱো, কিন্তু তোমাকে বা তোমাৰ সঙ্গে আমাদেৱও,
কোনো বিপদে পড়তে হবে না তো ? সেৱকম কোনো ভয় নেই তো ?’

ফুলৱা চোখ থেকে প্লাস নামলো, ওৱ চোখে চকিতেৱ জন্ম একটা
উদ্বেগেৱ ছায়া নামলো, ও খানিকটা যেন আপন মনেই অসুৰ্ব উচ্চারণ
কৱলো, ‘বিপদ...ভয়...’।..

অনুর জিজ্ঞাসু চোখেও এবাৱ একটা অবুৱ উদ্বেগেৱ ছায়া ফুটলো !
সে একবাৱ কুমাৰেৱ দিকে তাকিয়ে ফুলৱাকে জিজ্ঞেস কৱশো, ‘বিপদ ?
কিসেৱ বিপদ, কিসেৱ ভয় ?’

‘কিছু না, কিছু না।’ ফুলৱা যেন ভয় পেয়েই, প্ৰায় চুপিচুপি ষৰে
বলে উঠলো, এবং আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু ওৱ নিজেৱ
ভৱসা বা বিশ্বাস যে তেমন নেই, সেটা ও নিজেই বুৰতে পাৱলো। এই
প্ৰথম ওৱ মনে হলো, কমলেৱ সঙ্গে একটু পৰিষ্কাৰ কথা বলে নেওয়া
উচিত। যদিও অপৰিষ্কাৰ তেমন কিছু নেই। ও কমলেৱ কথা কিছু
কিছু অংশ বন্ধুদেৱ মুখে শুনেছে, আৱ কমল নিজেও তাৱ আত্মপৱিত্ৰ
গোপন রাখাৱ কথা বলেছে। নিজেৱ নামটা সে উচ্চারণ কৱতে দিতে
চায়নি। তা না দিক, কিন্তু কুমাৰদাৱ কথাটা ফেলে দেবাৱ মতো না।
কমলেৱ সঙ্গে মেশা বা যোগাযোগ থাকাৱ মধ্যে, বিপদেৱ সম্ভাবনা
যথেষ্টই আছে। তথাপি, এ তো ভাবাই যায় না, যেহেতু কমলেৱ সঙ্গে
পৱিত্ৰ থাকা বা কথা বলাৱ বিপদ আছে, সেই হেতু, এখন থেকে তাৰু

সঙ্গে আৰ কথা বলা চলবে না। অসম্ভব ! বিত্রী ! এখন আৱ তা
ভাবাই যায় না। ফুলুৱা তা ভাবতেই পারে না, এমন কি, সত্য ওৱ
নিজেৰ যদি কোনো বিপদও হয়। কমল তো শত হলেও সেই কমল,
যাৱ দ্বাৰা কখনো কোনো অগ্রায় কৱাই অসম্ভব। কমল তো আসলে
সেই কমল, বুদ্ধিমুণ্ড, হাসিখুশি, উদাৰ আৱ ঠাট্টাপুৱায়ণ, নিৰ্বাদ
প্রাণেৰ ছেলে। কিন্তু ফুলুৱাৰ মনে হঠাতে আৱ একটা খটকা লাগলো।
কুমারদা একথা বললো কেন ? সে কৈ বুৰতে পেৱেছে, আৱ সেই-
জন্মই বিপদ আৱ ভয়েৰ কথাটা তুললো ?

ফুলুৱা কুমারেৰ দিকে ফিরে কিছু জিজ্ঞেস কৱতে উদ্বৃত হতেই,
বাসেৰ আকাশ মাঠ আৱ কান ফাটানো তীক্ষ্ণ হৰ্ণ বেজে উঠলো। যাৱা
বাইৱে ছিল, তাৱা ছড়োছড়ি দৌড়াদৌড়ি কৱে বাসেৰ দিকে ছুটে
গেল। কুমাৰ অবাক হয়ে বললো, ‘আৱে বুবাইটা কোথায় গেল ?’

তিনি জনেই ব্যাকুল হয়ে আশেপাশে তাকালো। ফুলুৱার প্ৰথমে
চোখ পড়লো, একটা গাছতলাৰ ছায়ায়, শোষ্টাৱ-বটল হাতে, সেই
তিনি জনেৰ সঙ্গে বুবাই কথা বলছে। কুমারেৰ মুখ শক্ত হয়ে উঠলো,
চিৎকাৰ কৱে ডাকলো, ‘বুবাই, ওখানে কৈ কৱছো ? শীগ্ৰিৰ এসো !’
বলে নিজেই সেদিকে এগিয়ে গেল।

বাসেৰ এঞ্জিন গঞ্জে উঠলো। বুবাই বাবাৰ দিকে ছুটে এলো।
অনু ডাকলো, ‘চলু ফুলি, উঠি !’

ফুলুৱাৰ চোখেমুখে অগ্রমনস্থতা। মুখে বিন্দু বিন্দু ধাম, বললো,
‘চলো !’ ও বাসেৰ দিকে এগিয়ে গেল, আৱ তখনই ওৱ চোখে পড়লো,
একটা জীপ গাড়ি বাসেৰ দিকে, পিছন থেকে এগিয়ে আসছে। ও
একবাৰ কুমারেৰ দিকে তাকালো। কুমাৰও তাকালো ওৱ দিকে।
কুমারেৰ চোখে উদ্বেগেৰ ছায়া। ফুলুৱা আবাৰ জীপ গাড়িটাৰ দিকে
দেখলো। দেখা গেল না, বাসেৰ পিছনে সেটা আড়ালো পড়ে
গিয়েছে।

॥ এগারো ॥

বাসের পিছনে জীপটার কথা কি কমলকে জানানো দরকার? খুব স্পষ্টভাবে না হলেও, পুলিশের জীপ বলেই মনে হলো। ফুল্লরার যদি ভুল হয়েও থাকে, কুমারদার নিশ্চয়ই হয়নি। জীপটার দিকে চোখ পড়তে, কুমারদার চোখের দৃষ্টিও কেমন হয়ে উঠেছিল। হঠাতে ঘেন একটা অলৌকিক ঘটনার মতো জীপটার আবির্ভাব। যখন কুমারদা তয় আর বিপদের কথা বলেছিল, ঠিক তখনই জীপটাকে দেখা গেল। কমলকে নিয়ে, কৌ অহুমানে কুমারদা বিপদের কথা বলেছিল? কথা শুনে মনে হলো, তার অহুমানটা যেন নির্ধারণ।

কমল উঠে দাঢ়াতে যাচ্ছিল। ফুল্লরা বললো, ‘এবার তোমাকেই জানালার ধারটা ছেড়ে দিছি, আমি বরং এই সৌচে বসি।’

কমলের কালো ঠুলিতে অবাক খিলিক, খিলিক সাদা দ্বাতের হাসিতে, জিজ্ঞেস করলো, ‘হঠাতে?’

ফুল্লরার হাসিটা তেমন স্ফুরিত না, একটু আড়তই। কমলের দিকে ঠেলে সরে এলো, আর কমলকে তেরো নম্বর সৌচের কাছে সরে যেতেই হলো। ও কমলের জায়গায় বসে বললো, ‘বসো না, আমি তো অনেকক্ষণ জানালার ধারে বসেছি।’

কমলের হাতে ‘মেটামরফোসিস...।’ জানালার ধারে বসে, ফুল্লরার দিকে তাকিয়ে বললো, ‘বসে তো ছিলেই। হঠাতে সাবালিকা হয়ে উঠলে কেন, আর উদার?’

ফুল্লরার চিন্তাগ্রস্ত অশ্রমনক্ষতার মধ্যেও, ভুঁক কুঁচকে উঠলো, বললো ‘সাবালিকা?’

‘তাই তো মনে হচ্ছে।’ কমল বললো, ‘ছোটি মেয়েটি জানালার
ধারে বসবার’ জন্য তো পাগল হয়েছিল, তাই।’ সে কথা শেষ করলো
ন্টা।

ফুলরা হেসে উঠলো। কিন্তু হাসিটা উচ্ছ্বসিত না। বললো, ‘ওহ!
ওখন তো তোমাকে চিনতাম না। এখন তোমাকে একটু ভাগ দিতে না
পারলে থারাপ লাগবে।’

কমল হেসে উঠলো, স্বর নামিয়ে বললো, ‘বন্ধুর জন্য।’

‘একটা কথা।’ ফুলরা ওর রঙীন স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর থেকে, কমলের
কালো ঠুলির দিকে তাকালো। ওর স্বর নিচু আর উদ্বিগ্ন, ‘একটা জৌপ
বাসের পেছনে পেছনে আসছে। মনে হলো পুলিশের জৌপ।’

কমলের চোখের কালো ঠুলি থেকে শুরু করে, কুচকুচে কালো
গোঁফ দাঢ়ি আর ঘাড় বেয়ে পড়া চুলে, চকিতেই যেন একটা পরিবর্তন
দেখা দিল। ঠিক চমক লাগা যাকে বলে, তা না। একটা উজ্জল
ফটোগ্রাফ যেন মুহূর্তেই নেগেটিভে পরিণত হলো। কমল প্রথমে
সামনের দিকে তাকালো, তারপর ধৌরে ধৌরে ডাইনে বাঁয়ে। বাঁ
কোমরের কাছে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরলো। নিচু স্বরে বললো,
‘শুনতে পাচ্ছি।’ এবং মুহূর্তের জন্য পরিবর্তনটা ওর সারা অবয়বের
মধ্যেই ফুটে ওঠে, আবার আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওকে
দেখালো যেন আগের থেকেও বাকবাকে।

ফুলরা কমলের এই পরিবর্তনটা স্পষ্ট বুঝতে পারলো না, কেবল
মনে হলো, কমলের ভিতরে বাইরে যেন একটা কী ঘটে গেল। ও
অবাক নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ‘কী শুনতে পাচ্ছো?’

‘পেছনে একটা জৌপের শব্দ।’ কমল তেমনই নিচু স্বরে
বললো। বাঁ কোমরের কাছে ওর চওড়া হাতের মুঠি শব্দ হয়ে
উঠলো।

ফুলরা উৎকর্ণ হলো, পিছনে জৌপের শব্দ শোনার চেষ্টা করলো,
কিন্তু বাসের এঞ্জিনের আর চলমান বড়ির ঝমঝমে শব্দ ছাড়া কিছুই

শুনতে পেলো না। ও ওর স্বচ্ছ কাঁচের ভেতর দিয়ে অবাক চোখে কমলের দিকে তাকালো। কমলের দৃষ্টি এখন সামনে, ডাইনে বাসের ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরাও সেদিকে তাকালো, আবার কমলের দিকে। কমলের মুখ ড্রাইভারের দিকে। ফুল্লরা কিছু বুঝতে পারছে না। কমল কি ড্রাইভারকে কিছু সন্দেহ করেছে? কমল ওর মাথা উচু করে ঘাড় তুলে, আর একটু ডান দিকে ঝুঁকলো। ও কি পিছনফেরা ড্রাইভারের মুখ দেখবার চেষ্টা করছে? সে তো অসম্ভব! ফুল্লরা কুমারের দিকে দেখলো। সে কোলের ওপর ম্যাগাজিন খুলে রেখে, ওর দিকেই তাকিয়েছিল। তার চোখে মুখে অস্তি। ফুল্লরার সঙ্গে চোখাচোখি হতে, সে কমলের দিকে দেখলো। অনুর আর বুবাইয়ের দৃষ্টি এদিকে নেই, তু'জনেই জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে।

‘দেখা যাচ্ছে না।’ কমল বললো।

ফুল্লরার বিশ্বায় বাড়ছে। জিজ্ঞেস করলো, ‘কী দেখা যাচ্ছে না?’

কমল বললো, ‘জীপটা। কিন্তু শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পেছনে পেছনে আসছে।’

ফুল্লরা অবাক চোখে পিছন ফিরে তাকালো। দূরের রাস্তার ধু ধু রেখা ধুলোয় হারিয়ে যাচ্ছে।

কমল বললো, ‘এখান থেকে পেছনে তাকিয়ে দেখা যাবে না। সামনের রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না।’

রিয়ার ভিউ-ফাইণ্ডারের কথা ফুল্লরার মনেই আসেনি। কমলের কথা শুনে ও ড্রাইভারের ডান দিকে জানালার বাইরে তাকালো। ফাইণ্ডারের কাঁচটা ও দেখতে পেলো না। ড্রাইভারের আড়াল পড়েছে, তা ছাড়া ওর উচ্চতার অস্থিধাও আছে। ডানদিকে বুবাইয়ের জায়গায় বসলে নিশ্চয়ই দেখতে পেতো। জীপটা দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু কমল তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, পেছনে পিছনেই আসছে। ফুল্লরা বারে বারে কমলের মুখের দিকে দেখতে লাগলো। কমল মাথা উচু

করে, আগের মতোই সামনের ডানদিকে দেখছে। রিয়ার ভিউ-ফাউণ্ডার। কিন্তু কমলের চোখমুখের চেহারা কেমন দাঢ়িয়েছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ফুল্লরা বুঝতে চাইছে। জানতে চাইছে, কমলের উদ্বেগ কতোখানি। ও ভয় পেয়েছে কী না। চোখের পাশ অবধি ঢাকা টুলিটা খুলমেষ্ট, ওর চোখ দেখলেই মুখের অবস্থা বোঝা যেতোঁ। কিন্তু কমল কি ভয় পাবার ছেলে? হ'এক বছরের মধ্যেই ওর সম্পর্কে এমন সব কথা শোনা গিয়েছে, তৃর্ধ্ব আর দুঃসাহসিক বলতে যা বোঝায় ভয়ের কথা ভাবাই যায় না।

ফুল্লরার নিজের ভয় বাড়ছে। এ ভয়টা ঠিক নিজের জন্ম না। কমলকে কেন্দ্র করে, সন্তান্য বিপদের চেহারাটা কী দাঢ়াতে পাবে, সেই আশঙ্কায় ওর ভয় বাড়ছে। তা ছাড়া কমলকে একম উদ্গ্রাব আর উৎকর্ণ হয়ে থাকতে দেখলে, নিশ্চিন্ত হওয়া দূরের কথা, সমস্ত ঘটনার গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেক বেশি। অথচ বাস-ভরতি লোকগুলো আপন মনে আগের মতোই গন্ত করছে, হাসাহাসি করছে। এমন কি পিছনের তিনজনের মধ্যে, সম্ভবত সেই স্বকুমারই একবার বলে উঠেছে, ‘মালা বদলের বদলে জায়গা বদল! ’ তারপরেই আবার আদরিব গান্ধির প্রতে ঘাচ্ছিল, বাধা পেয়ে থেমে গিয়েছে।

ফুল্লরা নিচু স্বরে বললো, ‘তুমি কী ভাবছো? কোনো বিপদ-আপদ ঘটতে পারে?’

‘কিছুই অসন্তুষ্ট নয়।’ কমল মুখ নামিয়ে বললো, ‘বরং খুবই সন্তুষ্ট।’

ফুল্লরার বুকের মধ্যে নতুন করে ভয়ের চমক লাগল, জিজ্ঞেস করলো, ‘কী হতে পারে? ওরা পরের স্টপেজে বাসের মধ্যে এসে উঠবে?’

‘তা কেন?’ কমল বললো, ‘ওরা মাঝপথেই বাসটা দাঢ়ি করাতে পারে।’

ফুল্লরার মুখ দিয়ে কথা সরলো না। কমল আবার বললো, ‘সে

সন্তানটাই বেশি। অবিশ্ব যদি ওদের কাছে থবৰ থাকে। শো
এখনো পেছনে পেছনে আসছে, আমি ঠিক শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

আশ্চর্য ! ফুল্লুরার এই উদ্বেগ, ব্যাকুলভাৱ মধ্যে মনে হলো, জীপেৱ
শব্দটা ও কিছুতেই আলাদা কৱে শুনতে পাচ্ছে না। ও বললো,
'কুমারদাই প্ৰথম বিপদ-আপদেৰ কথা বলছিল।'

'কে কুমারদা ?' কমল যেন আকস্মিক উত্তেজনায়, সন্দিগ্ধ আৱ
উৎসুক হয়ে উঠলো।

ফুল্লুৰা বললো, 'আমাৰ দিদিব বৱ, এই যে আমাদেৱ ডাম
পাশে—।'

'উনি কেন বিপদ-আপদেৰ কথা বলেছেন ?' কমল ফুল্লুৰাৰ কথা শেষ
হৰাৰ আগেই বলে উঠলো, 'বিপদ আপদেৰ কথা উনি কি কৱে জানলেন ?
কৌ কৱেন উনি ? আমি তোমাকে এসব কিছুই জিজ্ঞেস কৱিনি।'

ফুল্লুৰা অবাক চোখে কমলেৰ কালো ঠুলিৱ দিকে তাকালো। কালো
ঠুলিটাৰ দিকে দেখেই বুঝতে পাৱলো, কমলেৰ দৃষ্টি তৌক্ষ হয়ে উঠেছে।
কমল একবাৱ মুখ ফিরিয়ে চকিতে কুমাৰেৰ দিকে দেখেও নিল। কিন্তু
কুমারদাৰ সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞাসাৰ কাৰণ কৌ ? কুমারদা কৌ কৱে,
কমলেৰ সেটাৰ জ্ঞান দৰকাৰ ?' আৱ সেটা জিজ্ঞেস কৱেনি বলে, ওৱল
স্বৰে উত্তেজিত হতাশা, অথচ কেমন কঠিন। কমল কেমন বদলিয়ে
যাচ্ছে, এইটুকু সময়েৰ মধ্যে ফুল্লুৰাৰ মনটা
বিমৰ্শ হয়ে উঠলো। নিজেকে কেমন অপৱাধী মনে হচ্ছে, অথচ ও
কোনো দোষ কৱেনি। বললো, 'কুমারদা একটা বেসৱকাৰী ফার্মে
কাজ কৱে। কেন ? তুমি জিজ্ঞেস কৱলো আমি নিশ্চয়ই বলতাম।'

'আমাকে ভুল বুঝো না !' কমল নিচু কৃত স্বৰে বললো, 'উনি কেন
বিপদ-আপদেৰ কথা বলছেন, আমি বুঝতে পাৱছি না।'

ফুল্লুৰা বললো, 'আগেৱ স্টেপেজে যথন নেমেছিলাম, তথন তোমাৰ
কথা ওৱা জিজ্ঞেস কৱেছিল। আমি তোমাৰ কোনো পৱিত্ৰ দিইনি,
বলেছি আমাৰ পুৱনো বস্তু।'

‘ওঁরা নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছেন, বন্ধুর নামধার না বলায়?’ কমল
জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা বিব্রত হয়ে বললো, ‘তা হয়েছে।’

‘আর তুমি নিশ্চয়ই বলেছ, বন্ধুর নাম ধার বলার অনুবিধা আছে,
তাই না?’ কমল তৎক্ষণাত আবার জিজ্ঞেস করলো।

ফুল্লরা অবাক চোখে কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল
হঠাতে একটু হেসে উঠলো, ‘বুঝেছি।’

কমলকে হাসতে দেখে, ফুল্লরার অপরাধ বোধটা বেড়ে গেল।
বললো, ‘আমি অন্যায় করেছি, না?’

‘না, ভুল।’ কমল বললো, ‘মানে একটু বোকামি, কিছু মনে করো
না। একটা যে-কোনো নাম, একটা যে-কোনো পরিচয় দিয়ে দিলেই
হত্তো। কিছুই না বলার থেকে, কিছু বলা ভালো, তাই না? তোমার
কুমারদা খুব সচেতন মানুষ। প্রায় ঠিক ব্যাপারটাই আঁচ করেছেন।
কিন্তু—।’ কমল হঠাতে সোজা হয়ে বসলো, ঘাঢ় উঁচু করে, সামনে ডান
দিকে তাকালো, প্রায় ফিসফিস স্বরে বললো, ‘জৌপ হন’ দিচ্ছে।’

ওর কথার সঙ্গে সঙ্গেই, বাসের ভিতরে ছবার বেল বেজে উঠলো।
মুছ ব্রেক কবার একটা ঝাঁকুনি লাগলো, এবং বাস রাস্তার বাঁ দিকে
একটু সরে গেল। জৌপের তীক্ষ্ণ হর্ন ঘন ঘন বাজছে, পিছন থেকে
ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে, ফুল্লরা শুনতে পাচ্ছে। ও দেখলো,
কমল সামনের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এখন ওর ডান হাত
বাঁ কোমরের কাছে, বাঁ হাত দিয়ে সামনের সৌটের রাড মুঠি করে
থরা।

বাস আর একটু বাঁয়ে চাপলো, গতি আরো কিঞ্চিৎ মন্ত্র হলো।
জৌপের হর্ন এখন একেবারে বাসের গায়ে গায়ে, জৌপটাকে দেখা
যাচ্ছে।

॥ বার ॥

অদৃশ্য অথচ গঁজিত জৌপটা, বাসের পাশ দিয়ে ছুটে হঠাতে রাস্তার ওপর ভেসে উঠলো। তাঁরবেগে ছুটে চলেছে। জৌপের পিছনে নিশানের মতো উড়ছে একটা নাল রঙের রেশমী শাড়ির আঁচল। ভেসে এলো ছেলেমেয়েদের সমাতে গানের কলি, ‘আজ জ্যোষ্ঠা রাতে সবাই গেছে বনে।’...তার অধোই একটি ছেলের চিংকার শোনা গেল, ‘টা টা,’ শুড়বাই!...বাসটা রাস্তার মাঝখানে সরে এসে গতি বাঢ়লো। দ্রুতগতি জৌপটার পিছনে, ভিতর দিকে ঠাসাঠাসি একটা ভিড়। বাসের ভিতরে কয়েকবার ক্লিয়ারেন্স ঘট্টা বেজে উঠলো।

ফুল্লরার চিবুকে ঠোটের ওপরে, নাকের ডগায়, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এখনো নিখাস পড়তে চাইছে না, বুকটা ফুলে উঠেছে। ডানহাত দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরে আছে ডান দিকের হাতল। চোয়াল ছুটে এখনো শক্ত। দূরে দ্রুত মিলিয়ে যাওয়া জৌপ থেকে চোখ ফিরিয়ে, কমলের দিকে তাকালো।

কমলের কপালে আর চোখের কোলে, কালো ঠুলির নিচেই, ঘামের চিকচিকে বিন্দু। নাকটা টকটকে লাল। কালো ঠুলি ছুটো গভীর অঙ্ককার। বাতাসের বাপটায় বঁা দিকের চুল দাঢ়ি কাপছে, তথাপি ঘাম শুকায়নি। ও আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে ফুল্লরার দিকে তাকালো, আর আস্তে আস্তে ঠুলির অঙ্ককারে আলোর রেখা জাগলো।

ফুল্লরা কমলের মনের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারছে না। কালো ঠুলির ভিতর থেকে ও এখন ফুল্লরাকেই দেখছে, এটা স্পষ্ট। ওর দাঢ়ি ভরা গালটা এখন অনেক চওড়া দেখাচ্ছে। বঁা কোমরের কাছ থেকে হাতটা

তুলে, জানালার ধারে রাখলো, এবং আস্তে আস্তে একটু পিছনে ঢেলে, বাঁ দিকে মুখটা ফিরিয়ে নিল।

ফুল্লরা তাকালো কুমারের দিকে। কুমারের চোখ কমলের দিকে ছিল, এখন ফুল্লরার দিকে তাকালো। কুমারের গোটা মুখ ঘায়ে ভেজা। হঠাৎ-ই যেন তাব মুখে অনেকগুলো রেখা জেগে উঠেছে, আর খুব অবসর দেখাচ্ছে। নখনো তাব চোখে উদ্বেগের ছায়া। অবাক দৃষ্টি ফুল্লরার চোখের শুপরে রাখা, এবং হস্ত করে একটা নিশাস ফেললো। আর চকিতে একবার কমলের দিকে দেখে, খুব আস্তে মাথা ঝাঁকালো। অনু বুবাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে। বুবাই চলে যাওয়া জীপ আব তাব আরোহীদের সম্পর্কেই মাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করছে। শুরো কারা, কেন গান করছিল, কেন টা-টা গুড়বাট কবলো, এবং ওরাও পুরো যাবে কো না। অনু সাধ্যমতো জবাব দেবাব চেষ্টা করছে।

কুমার হিপ্প পকেট থেকে দোমড়ানো কমাল দের করে মুখ ঘোড় গলা মুছতে আরম্ভ করলো। ফুল্লবাও যেন হঠাৎ অনুভব করলো, ও ঘেমেছে। কোমরে গুঁজে রাখা কুমালটা টেনে নিয়ে চিবুকের কাছে চেপে ধরেই, ও কমলের দিকে তাকালো। কমলও তো ঘেমেছে, ও ঘাম মুছবে না? নিজের ঘাম মুছতে গিয়ে এ কথাটাই ওর প্রথম মনে এলো। কিন্তু ও তা জিজ্ঞেস করলো না, এবং ওর মনে একটা ইচ্ছা জাগলো, আব ইচ্ছাটাকে একটা উদ্বিগ্ন নিশাসের সঙ্গে ত্যাগ করলো। কমলের টুলিতে এখন অঙ্ককার। ওব চুল উড়ছে। মাথাটা এখন অনেকখানি বাঁ দিকে হেলানো।

ফুল্লরা চিবুক আর গলার কাছে চেপে চেপে ঘাম মুছলো। কিন্তু ঘাম এখন অনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে। ওর নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুর্বল লাগলো। ও সামনের দিকে এগিয়ে, তু পা ছড়িয়ে দিয়ে, যতোটা সম্ভব সমস্ত শরীরটাকে পিছনে এলিয়ে দিল, কিন্তু বুকজোড়া, নিজের চোখেই বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, তাই ডান দিক থেকে আঁচল টেনে

বুক ঢেকে বাঁ দিকের জামায় গুঁজে দিল। চোখ বুজলো, আর বাসের ভিতরে যাত্রীদের ছোটখাটো কথা কানে ভেসে আসতে লাগলো, যা কিছুটা অর্থহীন শব্দের মতো। কমল যেন তখন কৌ বলছিল ? ষ্টেডসিঙ্ক
রমণী...কুপাদের বাড়ি।...ওহ, জীপটা যদি সত্যি পুলিশের হতো, আর
যা সন্দেহ করা গিয়েছিল, তাই যদি ঘটতো ? এখন সমস্ত ব্যাপারটা
তিনি জনের মধ্যে আচে। কমল, ওব আর কুমারের মধ্যে। একটা
ভয়ের সন্তান। এখন সব সময়ের জন্যই জেগে বইলো। নিজেদের মধ্যে
স্পষ্ট কোনো কথাবার্তা না বলেও, একটা সন্তান। এখন স্পষ্টতর হয়ে
উঠলে, যে-কোনো মুহূর্তে, যে-কোনো যায়গায়, পথের মাঝখানে
বা কোনো স্টপেজে, এবং সমুদ্রের ধারে পৌঁছুনো পর্যন্ত। এ রকম
একটা যাত্রায়, কিমলের সঙ্গে কেন দেখা হলো ? কমল চেনা না দিলেই
বা শক্তি কৌ ছিল ? ফুল্লরা কখনোই চিনতে পারতো না, কারণ অচেনা
চুল-দাঢ়িওয়ালা তেরো নম্বরের দিকে ভালো করে ও কখনো তাকিয়ে
দেখতো না, এবং একবাবণ চেনা চেনা মনে হয়নি, যে কারণে ভালো
করে খুঁটিয়ে দেখবার দরকার ছিল না। তেরো নম্বর, তেরো নম্বরই
থেকে যেতো, আর তার মেটামরফোসিস...।

ফুল্লরার মন এখন একটা অঙ্গুত আলাদা পথে ভেসে চললো।
অভিমানে ভরে উঠছে ওর মন, এটা আশ্চর্য ! ওর বাঁ কমলের
কোমরের কাছে ছুঁয়ে আচে। একটা দৃঃখ আর ক্ষোভ ওর মনে জেগে
উঠছে। অথচ একটা লজ্জা। মনের মধ্যে কড় রকমের অশুভতি
একসঙ্গেই জোট পাকিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ধারার মতো,
সবগুলো মিলেমিশে একটা প্রবাহেই ছুটে চলে। হ্যাঁ, ও তো কমলকে
ভুলেই গিয়েছিল। ঠিক মনে রাখা বলতে যা বোৰায়, সেরকম করে
কখনোই আর মনে রাখেনি : মনে করে রাখাটা কি কারোর ইচ্ছা
মতো ঘটে ? ইচ্ছা করলেই মনে রাখা যায় না। কিংবা ইচ্ছাটাই
হয়তো : তখন তার আদল বদলিয়ে নেয়, আর মন থেকে অনেক কিছু
সরে যায়। হারিয়ে যায়। কমল ওর কাছে আস্তে আস্তে অবাঞ্ছব

হয়ে উঠেছিল। অবিশ্বি সান্নিধ্যের মধ্যে না। অদৰ্শনে, জোবনের ভিস্তায় কমল অবস্থ হয়ে উঠেছিল, মন থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। আট মাসের কমল। হিসাবটা তো দেই রকমই।

কমল কেন হঠাতে ওরকম করেংকপাদের বাড়ির কথা বললো? স্বেদসিক্ত রমণী...কপাদের বাড়ি। এটা কি ব্যঙ্গ না বিদ্রূপ? ‘তা হলে কপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পাবি।’ কেমন একটা চ্যালেঞ্জের মতো শোনাচ্ছিল না ওর স্বর? তার আগে অবিশ্বি ফুলরাও জোব দিয়ে বলেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে। বলেনি কৈ?

হ্যাঁ, ফুলরা স্বেদসিক্ত ছিল। কপান জশ্বদিনের সেই বাতের সময়টা তো গ্রীষ্মকালট ছিল। কপান বাবা মা অভিভাবকদের কাছ থেকে ওবা কিছুটা সময় নিজেদের জন্য আলাদা করে নিয়েছিল। সেই কিছুটা সময় ওদের কেটেছিল দোতলায় আব ভাদে। আলিপুরের সবকারি বাড়িটা ছিল বিরাট। অভিভাবক আর বয়স্ক অতিথি অভ্যাগতরা সবাই একতলায় ছিলেন। ফুলরা জানতো না, কিন্তু নিষ্ঠয় কপা বস্তুদের সঙ্গে আগেভাগে পরামর্শ করে, কয়েক বোতল বৌয়ারের ব্যবস্থ করে রেখেছিল। অথবা কমল, বা হিমাত্রি বা শ্যামল, ওরা কেউ লুকিয়ে এনেছিল। বিমানের পক্ষে একেবারেই সন্তুষ্ট ছিল না। টাকা তো ওর কাছে কথমোই থাকতো না, ওব সেরকম সাহসও ছিল না।

একটা ছেলেমানুষি ফুর্তি। নিজেদের চুঃসাহসী বেপরোয়া ভাববাদ খানিকটা আনন্দ। অনেকগুলো আলোই নেভানো ছিল। চুরি করে বেপরোয়া হওয়া ছাড়া তো কিছু না! কপাদের বাড়িতে জানাজানি হলেও হয়তো ব্যাপারটাকে তেমন একটা অপরাধজনক ব্যভিচার বা ওদের ডিজেনারেটেড বলা হতো না। গেলাস আনা হয়নি। কে কে যেন দাঁত দিয়েই বৌয়ারের বোতলের ছিপি খুলেছিল। ফেনিলোচ্ছাসের একটা চেউ। কাড়াকাড়ি করে খাওয়া, অথবা কারোকে জোর করে খাওয়ানো। আর ছেলেমেয়ে, সকলের হাতে ঠোটেই একটা করে অলস্ত সিগারেট।

কে ফুল্লরার মুখে প্রথম বোতল থেকে ঢেলে দিয়েছিল ? ওর বুকের শাড়িতে কিছুটা চলকিয়ে পড়েছিল । বিক্রী তেতো । হিমাঞ্জি ? শ্যামল ? কমল ? বিমান সব সময়ে ওর পেছনে লেপ্টে ঠাড়িয়েছিল । বিমান আর ওকে নিয়ে, তখন সবাই মোটামুটি একটা সিঙ্কান্তে পৌছে গিয়েছিল । বিমান যদি সত্যি—সত্যিকারেব একজন কবি হতো, তা হলে বন্ধুদের সিঙ্কান্তে কোনো ভুল হতো না । ফুল্লরাব মনের কথাটা কেউ জানতো না । ঠিক, ও খুব বেশি বিমানের সঙ্গে মিশেছিল । বিমান কবিতা লিখতো । একজন কবি ওর কাছে পরম বিস্ময়, নিবিড় মুঝ্বতা যা আদৌ বিমান ছিল না । ফুল্লবা আশা কবতো । বিমান আসলে মনেব দিক থেকে কাব ছিল না । এমনকি ওর হাতেব স্পর্শে ঠোটের স্পর্শেও ও কোথাও কবি ছিল না । ওর কোনো ক্ষুধাই ছিল না, অথচ ও ছিল অভুক্ত আর অস্বস্থ । এ কথা ফুল্লরা কারোকে বলতে পারেনি, বলতে চায়নি, মনে মনে জেগে উঠেছিল অস্মীকার । এখন বিমান কী করে ? একজন প্রগতিশীল ফিল্ম ডাইরেক্টরের এ্যাসিস্টান্ট আর চিত্রনাট্যও নাকি লেখে । আর এখনো কালেভত্তে ভুল বানানের কবিতা বেরোয় নামকরা একটা সাম্প্রাহিকে ।

ফুল্লরার হাতেও জলন্ত সিগারেট ছিল, আর, ও ফুক ফুক করে টেনেছিল । কে ওর মুখে তারপরে বৌয়ারের বোতল চেপে ধরেছিল ? কমল ? ও কয়েক টোক গিলে ফেলেছিল । তেতো, বিক্রী, ওর উদ্গার উঠেছিল, আর পেটের মধ্যে কলকলিয়ে উঠেছিল, আর গঙগল করে ঘেমেছিল । হাসাহাসি, ছুটোছুটি, কাড়াকাড়ি, জ্বোর করে গলায় ঢেলে দেওয়া, এবং কাদের সঙ্গে কখন ফুল্লরা ছাদে গিয়েছিল ? এবং কখন এক সময় ও হঠাৎ দেখেছিল, ছাদে আর কেউ নেই, ও আর বিমান ছাড়া ? একেবারে ভুলে যাবার কোনো কারণ নেই, ও তো মাতাল হয়ে যায়নি । কিন্তু কিছুক্ষণের জন্য, সবাইকেই একটা পাগলামিতে পেয়ে বসেছিল । শ্যামল দক্ষিণের বারান্দায় কাপাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়েছিল । আকাশে একটা ছোট চাঁদ ছিল,

কলেবর যার বাড়ির দিকে। তার মানে ঝুপার জন্ম শুরুপক্ষে। আবছা আর বাঁকা জ্যোছনা ছিল দক্ষিণের বারান্দায়। তখন কে বলে উঠেছিল, ‘ঝুপা, তোকে সবাই আজ আমরা একটা করে চুমো খাবো।’

না, কোনো ছেলে বলেনি, মেঘেদের মধ্যে কেউ বলে উঠেছিল। না, ফুলরা ভুলে যায়নি, কেন ও আর বিমান ছাড়া ছাদে, সেই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না। ছোট টাদের আবছা আলো। কৃষ্ণচূড়ার ছায়াটা বেশ বড় হয়ে ছাদের বুকে ছড়িয়েছিল। সেই এক ভুল, ওরা ফুলরা আর বিমানকে একটু স্বযোগ দিয়ে গিয়েছিল। বিমান কখন কৌ ভাবে হঠাৎ ফুলরার দুই উরত প্রাণপণ শক্তিতে ঘন আবন্ধে চেপে ধরেছিল, আর ও নিচু হয়ে বিমানের হাতটা এক হাতে চেপে ধরেছিল। দ্বিতীয় হাতে চেপে বলেছিল, ‘না। বিমান ছাড়ো।’

বিমান তখন নরম কাদার বুকে, জংলি গাছের মূলে আগ্রাসী শোভে মুখ বাড়িয়ে দেওয়া শুয়োরের মতো। ও যে কোন মুহূর্তে ওরকম একটা এ্যাটেমপ্ট নিয়েছিল যা আর কখনো করেনি, ফুলরা একটুও টের পায়নি। ও রীতিমতো ক্ষ্যাপা আর বলশালী হয়ে উঠেছিল, আর গোঙানো স্বরে একটা আকৃতির শব্দ করেছিল। ওর হাত তখন অনেকখানি ভিতরে চলে গিয়েছিল; যেতে পেরেছিল, কারণ ও নিচু হয়ে কাণ্ডটা করেছিল একবারে আচমকা। ফুলরা ওর পরম্পর আবন্ধ শক্ত উরতে, বিমানের নথের আঘাত অন্তর্ভুব করেছিল। শায়া আর শাড়ির ওপর দিয়ে ওর হাতটা ফুলরা প্রাণপণে চেপে ধরেছিল। এক হাতে অসম্ভব বুঝে দু'হাতে চেপে ধরেছিল, আর নিচু হয়ে পড়ার দরুন, বুকের অঁচল বিমানের পিঠের ওপরেই ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং গলার স্বর কিছুটা তুলে বলেছিল, ‘ছাড়ো বলছি, ছাড়ো। আমি চিংকার করবো।’

বিমান ছাড়েনি, কথা শেনেনি, বরং আর একটু দৌর্য শব্দে গুড়িয়ে উঠেছিল। কিন্তু ফুলরা মরীয়া হয়ে উঠেছিল। এমন অস্বিধাজনক

ভাবে ওকে বিমানের হাতটা চেপে ধরতে হয়েছিল, কোমর থেকে শাড়ির বাঁধন একটু একটু করে খসে পড়েছিল। বিমানের হাত ক্রমাগত ওর উরু সঙ্গমের দিকে তিল তিল করে এগিয়ে যাচ্ছিল। ফুল্লরা খানিকটা নিরূপায় হয়ে, হঠাতে খানিকটা ঝুঁকে, বিমানের মাথার সঙ্গে মাথা টুকিয়ে ওর হাত হুটো সহ ঝুলে পড়েছিল। ওর শরীরের একটা ভার আছে, সেই ভারটা বিমানের ওপর কিছুটা চেপে বসতেই, হাত হুটোও কিছুটা নেমে এসেছিল। ফুল্লরা বেশ জোবে ফুঁসে ওঠা স্বরে ডেকে উঠেছিল, ‘বিমান ছাড়ো।’

বিমানের অন্ত হাতটা তখনই ফুল্লবার বুকে স্পর্শ করেছিল। সেটা নতুন কিছু না, কিন্তু ফুল্লরার কাছে তখন সেই চেমা স্পর্শও অসহ বোধ হয়েছিল। ও হঠাতে খানিকটা পিছনে ছিটকে ঘেতে পেরেছিল, আর, প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল, ‘না, আর না, ছাড়ো।’

ফুল্লরার শাড়ি তখন অনেকখানিই ছাদে লুটোচ্ছিল। বিমান জাহু পাতা অবস্থা থেকে উঠে দাঢ়িয়েছিল, এবং ফুল্লরার ছড়ানো আঁচল ধরে টানতে টানতে ওর দিকে এগিয়েছিল। বিমান তখন স্থান কাল পাত্র হিতাহিত সবই ভুলে গিয়েছিল। ফুল্লরাকে আর একবার হাত বাড়য়ে ধরবার মুহূর্তে কমল নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছিল। ও খুব আস্তে আস্তে এসেছিল, নিশ্চয় অনেক দ্বিধা আর বিশ্বাস নিয়ে। ওকে দেখতে পেয়েই, ফুল্লরা প্রায় আর্তনাদের স্বরে বলে উঠেছিল, ‘কমল, সেভ্ মী প্রিজ! এর হাত থেকে আমাকে ছাড়াও। ও যে কৌ জগন্ন!'

কমল তথাপি দ্বিধা করেছিল, কারণ ব্যাপারটা ছিল ফুল্লরা আর বিমানের। ফুল্লরা আবার ডেকে উঠেছিল, ‘কমল।’

কমল এগিয়ে এসে বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, নিচু স্বরে বলেছিল, ‘এই বিমান এই। ফুল্লরা কৌ বলছে শোন।’

বিমান শুনতে চায়নি, কমলের হাত থেকে এক ঝাপটায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছিল, আর সেটাই সপাটে গিয়ে লেগেছিল ফুল্লরার কাঁধের

কাছে। ফুল্লরা একটা অঙ্কুট শব্দ করে উঠেছিল, ‘ওর মাথায় কিছু
মেষ্টি, একটা দাতাল হয়ে উঠেছে।’

কমল তখন দ্বিধা-মুক্ত হয়েছিল, আর বিমানের ওরকম ভাবে হাত
ছাড়িয়ে নেওয়ায়, ওর জেদও নিশ্চয় ঝলকিয়ে উঠেছিল। ফুল্লরার
গায়ে ওরকম আঘাত লাগতে দেখেও, ও বেগে উঠেছিল। ও অত
হাত বাড়িয়ে, বিমানের একটা হাত চেপে ধরেছিল, আর বেশ জোরে
মোচড় দিয়ে টানতে টানতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বিমান ব্যথায়
কয়েকবার শব্দ করে উঠেছিল, ‘উহ ! উহ !’...কিন্তু কমল আব থামেনি,
বিমানকে টানতে টানতে একেবারে সিঁড়ির দরজাব কাছে নিয়ে, নিচের
দিকে ঢেলে দিয়েছিল। তারপর ফুল্লরার দিকে তার্কিয়ে ছিল।

ফুল্লরা তখনই যেন সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, আলসেব কাছে
সরে গিয়ে, পিঠে কর দিয়ে দাঢ়িয়েছিল। অঁচলটা গায়ে টেনে তুলে
দিতেও পাবত্তিল ন।। কমল দরজার কাছ থেকেই, নিচু স্বরে বলেছিল
ফুল্লরা, ও নিচে নেমে গেছে, তুমি এসো।’

ফুল্লরা তখন নড়তে পাবছিল না, আর মনের যতো বাগ আর
অপমান, সব গলার কাছ থেকে চাপা হ-হ শব্দে বেরিয়ে আসছিল।
চোখের দৃষ্টি ঝাপসা করে দিয়ে, জলে ভরে উঠেছিল। কমল নিশ্চয়
চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছিল, আব তাই ফুল্লরার কাছে এগিয়ে
গিয়েছিল। কিছুটা অবাক আর উদ্বিগ্ন স্বরে ডেকেছিল, ‘ফুল্লরা ?’

ওভাবে তখন নাম ধরে যে-কেউ ডাকতে পারতো। যেন একটা
ডাকেরই অপেক্ষা ছিল, ফুল্লরার গলায় কান্নার স্বর ফুটেছিল। কমল
ওর একটা হাত ধরে বলেছিল, ‘ফুল্লরা, তোমার কি কোথাও
লেগেছে ?’

ফুল্লরা কমলের হাতটা নিজের দুই ঠোটের ওপর চেপে ধরে, কান্নার
শব্দ চাপা দেবার চেষ্টা করেছিল, আর একজন বন্দুর কাঁধে ও একটা
হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। হ্যা, ফুল্লরা কমলের কাঁধে একটা হাত তুলে
দিয়েছিল, যে হাতটা কমল নিজেও চেপে ধরেছিল। আর সেইজন্ত

কি কমল ওই ভাবে কথাটা বললো, যেন একটা চ্যালেঞ্জের মুরে, ‘তা
হলে রূপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা আমি বলতে পাবি।’

কোন্ সূত্রে? স্বেদসিঙ্গু রমণী—রূপাদের বাড়ি, রূপাদের বাড়ির
এক রাত্রের কথা! কমলের হাসিতে কি বিজ্ঞপ? ব্যঙ্গ? কৌ ভাবে
কৌ ভেবে ও কথাটা বললো?

বাসে একটা ঝাঁকুনি লাগলো, ফুল্লরার কানে এলো একটা শব্দ,
‘লোধাশুলি।’

॥ তেরো ॥

কমলের সম্পর্কে এরকম ভাবতে থারাপ লাগে। বিবেক বা সেই
বকম +কছু ফুলরার মধ্যে জেগে ওঠে কী না, ও তা বুঝতে পারে না,
কমল সম্পর্কে থাবাপ কিছু ভাবতে, মনের মধ্যে আপনা থেকেই কেমন
একটা দ্বিধাব ছায়া পড়ে। কমল যদি সত্য চ্যালেঞ্জ করে কথাটা বলে
থাকে, ব্যঙ্গ বা বিজ্ঞপ করে থাকে, সেটা তো একরকমের নাচতা বলতে
হবে। এই কমল এখন এক আলাদা জগতের মাঝু, যদিও ওর
কথাবার্তা শুনে, ওব হাসি দেখে, হঠাৎ, হঠাৎ কিছু বোবা যায় না। ববং
ওর পর্তমানকে ঘিবে যে-সব বিভৌবিক। জড়ানো—ফুলরার এইরকম
ধাবণ তারপরেও এইরকম হেসে কথাবার্তা বলাটা কেমন একটু
অপ্রত্যাশিত। ওর বোঁ দিকের কোমরের কাছে কৌ লুকানো আছে,
ফুলবা তা অনুমান করতে পারে। ও কেন কিছুক্ষণ আগে কোমরের
কাছে শক্ত হাতে চেপে ধরেছিল, ফুলরা তাও আন্দাজ করতে পারে।
ওকে ঘিরে ত্রাসাচ্ছাদিত ভয়ংকর কিছু ছাড়া ভাবা যায় না, অবিশ্বি,
আর এসবের মধ্যেই ওকে শ্রদ্ধেয় আর মহৎ মনে হয়, আর ফুলরার
সঙ্গে ওব ব্যবধানটাও সেইখানেই। সেইজন্তুই ওকে আগের মতো
হেসে কথা বলতে শুনলে আচর্য লাগে।

তথাপি, সংশয় কি কাটে ? কাটে না। ফুলরার মনের ধোঁয়া সরে
যেতে থাকে, আব আগুন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অলুনি বাঢ়তে থাকে,
অপমানের জালা, কারণ কুপাদের বাড়ির ঘটনার পর, আট মাসের
জীবনটা এখন খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সেই সময়টা ভুলে যাওয়া ছাড়া
উপায় ছিল না, ফুলরা ভুলেও গিয়েছিল, যদিও সত্য সবকিছু ভোলা

যায় না। তাহলে এখন এরকম স্পষ্ট হয়ে উঠতো। না। সেই আট মাস তো এখন একটা ভবিষ্যতের নিশ্চিত ছবি ফুটিয়ে তুলেছিল। প্রায় একটা সিদ্ধান্তের মতো।

ফুল্লরা সরাসরি মুখ ফিরিয়ে কমলের দিকে তাকালো না। ঘাড় দ্বীপৎ বাঁকিয়ে, চোখের কোণে দেখলো। কমল বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এখনও জানালার পাশে, বাতাসে ওর চুল উড়ছে, দাঢ়ি কাপছে। ও কি চোখ বুজে আছে? একটা উৎকৃষ্ট সন্দেহের উদ্ভেজনার অবসানে ও কি এখন চোখ বুজে আলস্যে কাটাচ্ছে? মনে হয় না। ও এখনো সোজা হয়ে বসে আছে, আর মনে হচ্ছে, কৌ এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। ও এখন পুরীগামা বাসের মধ্যে নেই, অন্য কোথাও রয়েছে, ফুল্লরার ঠিক এইরকম মনে হলো। কুপাদের বাড়ির এক রাত্রের কথা যে ও বলেছিল, এখন সেসব নিশ্চয়ই মনে নেই, ভাবছেও না। এরকম ভাবেই ও প্রায় দু বছর আগে, অন্য এক জীবনে চলে গিয়েছিল। কষ্ট? খুবই কষ্ট হয়েছিল ফুল্লরার। কিন্তু নালিশ করার কথা মনে আসেনি। মনে কোনো নালিশই জাগেনি।

এখন জাগছে। কারণ এখন প্রশংস্তি স্বতন্ত্র। এখন কমলের কথার ব্যাখ্যার দরকার আছে। কোনো কোনো সম্পর্ক ছিল করার অধিকার সকলের আছে, কিন্তু তা নিয়ে বিজ্ঞপ্ত করার অধিকার থাকতে পারে না।

ফুল্লরার ঠোটের দুই কোণ শক্ত হয়ে উঠলো, আর ঠোটের ডগায় জিজ্ঞাসা উদ্বৃত্ত হলো। তবুও একবার কুমারের দিকে ফিরে তাকালো। কুমারদার হাতে খোলা ম্যাগাজিন, তার চোখও সেইদিকে ছিল। কিন্তু ফুল্লরা তার দিকে তাকানো মাঝই, সে চোখ তুললো। তার দুই চোখে জিজ্ঞাসা। বুবাই ওর মায়ের বুকের কাছে মাথা এলিয়ে দিয়েছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যর দৃষ্টিও বাইরের দিকে। কুমারের ভুঁক কুঁচকে উঠলো। ফুল্লরা কমলের দিকে মুখ ফেরালো।

‘এর পরে পর পর ছটো চেক পোস্ট পড়বে। ‘কমল ফুল্লরার দিকে

ଫିରେ ନିଚୁ ସ୍ଵରେ ବଲଲୋ, ‘ଚିଚ୍ରା ଆର ଦାରିଶୋଳ । ତାରପବେ ଜାମହୋଲା
ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିଜ, ତାଇ ନା ?’

ଫୁଲ୍ଲରାର ଚୋଥେର ସଙ୍ଗ୍ରହ ମାନ ପ୍ଲାସେ କୋନୋ କୌତୁଳ ନେଇ, ବଲଲୋ,
‘ଜାନି ନା ?’

‘ଏମନି ଜିଜ୍ଞେସ କବଳାମ ।’ କମଳ ବଲଲୋ, ‘ଆମି ଜାନି, ଆମାର
ମର ମୁଖ୍ସ ଆଛେ । ତବୁ ତୋମାକେ ତଥନ ନେକସ୍ଟ ସ୍ଟପେଜେର କଥା ଇଚ୍ଛେ
କରେଇ ଜିଜ୍ଞେସ କରେଛିଲାମ । ଯଦି ତୁମି ଆମାକେ ଚିନତେ ପାରୋ ?’ ଓ
ହାସଲୋ, ଆବାର ବଲଲ । ‘ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ପାର ହଲେ ଆମରା ଉଡ଼ିଶ୍ୟାୟ ପଡ଼ିବୋ ।
ତାର ଆଗେ, ଚେକ ପୋସ୍ଟ ଛଟୋ—’ ଓ କଥା ଶେଷ କରଲୋ ନା, ଜାନାଲା
ଦିଯେ ବାଇରେ ଦିକେ ମୁଖ ଫେରାଲୋ ।

ଓ ଓର ନିଜେର ଭାବନାୟ ଆଛେ, ଫୁଲ୍ଲରା ବୁଝିତେ ପାରାଛେ । ପର ପର
ଛଟୋ ଚେକପୋସ୍ଟ ଓବ ମାଧ୍ୟମ ସୁରାହେ । ବୋଧ ହୟ ସେଥାନେ ବିପଦେର
ସଂତୋଷନା ନିଯେ ସନ୍ଦେହ କରାଛେ । ଉଡ଼ିଶ୍ୟାୟ ପୌଛୁଲେ କି ଓର ବିପଦ କେଟେ
ଯାବେ ? ତା ଯା-ଇ ହୋକ, ଏମବ ସଂତୋଷନା ନିଯେ, ଆପାତତଃ ଫୁଲ୍ଲରାର ମନେ
କୋନୋ କୌତୁଳ ବା ଉତ୍ତେଜନା ଜାଗାଛେ ନା । ଓର ବା କରୁଇଟା ଏଥିମୋ
ହାତଲେର ଓପରେ, କମଲେର କୋମରେ ଏକଟୁ ଚାପ ଦିଯେ ବଲଲୋ, ‘ତଥନ ତୁମି
ଓ କଥା ବଲଛିଲେ କେନ ?’

‘କୋନ୍ କଥା ?’ କମଳ ମୁଖ ଫେରାଲୋ, ଓର କାଲୋ ଠୁଲିତେ
ଜିଜ୍ଞାସା ।

ଫୁଲ୍ଲରା ବଲଲୋ, ‘କପାଦେର ବାଢ଼ିର ସେଇ ରାତ୍ରେର କଥା ?’
ତୋମାର କଥା ଶୁଣେ ମନେ ପଡ଼େ ଗେଲ ।’ କମଳ ହାସଲୋ, ଝିଷ୍ଠ
ବୁଁକେ ବଲଲୋ, ‘ତୁମି ଯେ ସେଦମ୍ବିକୁ ରମଣୀର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ବଲଛିଲେ,
ତାଇ ।’

ଫୁଲ୍ଲରାର ମୁଖେ ରଙ୍ଗେର ଛଟା ଲେଗେ ଗେଲ, ତୁ ଚୋଥ ବଲକିଯେ ଉଠିଲୋ,
ଗଞ୍ଜୀର ଆର ତୀଙ୍କ ନିଚୁ ସ୍ଵରେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲୋ, ‘କୀ ତୋମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ?’

କମଳ କୋନୋ ଜ୍ବାବ ନା ଦିଯେ, କେବଳ ହାସଲୋ । ଓର ଘକଘକେ

ଦୀତ ଦେଖା ଗେଲ । ହେସେ, ଜ୍ବାବ ନା ଦିଯେ ମୁଖ ଫିରିଯେ ନେବାର ଉଠୋଗ କରିତେଇ, ଫୁଲରା କୃତ ଧାରାଲୋ ସ୍ଵରେ ବଲେ ଉଠିଲୋ, ‘ବଲୋ, ତୋମାର ବଳା ଉଚିତ, କୌ ତୋମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ।’

କମଳ ଫିରେ ତାକାଲୋ, ଓର ଚୋଥେ ଠୁଲିର ଭିତର ଥେକେ, କପାଳେ ଏକଟା ରେଖା ବେଁକେ ଉଠିଲୋ । ତାରପରେ ଚୋଥ ଥେକେ ଠୁଲିଟା ଆଣ୍ଟେ ଆଣ୍ଟେ ଥୁଲେ, ଚକିତେଇ ଏକବାର ଆଶେପାଶେ ଦେଖେ ନିଯେ, ଫୁଲରାର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ମୋଟା ଭୁକର ନିଚେ, ଓର ଦୁ ଚୋଥେ ବିଭାନ୍ତ ବିଶ୍ୱଯ । ଫୁଲରା ଓ ଓବ ଚୋଥେର ଦିକେ ତାକାଲୋ । ଫୁଲରାର ମୁଖେ ରଙ୍ଗାଭା ଏଥନ ଆରୋ ଗାଢ଼, ମାକେର ପାଟା କାପଛେ । କମଳ ଅବାକ ସ୍ଵରେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲୋ, ‘ତୁମି ରେଗେ ଗ୍ୟାଛୋ ନାକି ?’

ଫୁଲରା ତାର କୋନୋ ଜ୍ବାବ ନା ଦିଯେ ବଲିଲୋ, ‘ଆମି ତୋମାର ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା ଶୁଣିତେ ଚାହିଁ ।’

କମଲେର ହାସିଟା ହେଁ ଉଠିଲୋ କେମନ ଆଡ଼ିଷ୍ଟ, ଅବାକ ଚୋଥେ ମୁଖେ ନେମେ ଏଲୋ ଏକଟା ଡ୍ଲାନିତାର ଛାୟା । ହାତେର ଠୁଲିଟା ସହ, ଏକବାର ଗାଲେ ଶ୍ପର୍ଶ କରିଲୋ, ତାରପରେ ବଲିଲୋ ‘ତୁମି ଥୁବ ସେମେହିଲେ, ତାଇ ନା ? କପାଦେର ଛାଦେର କଥା ବଲଛି । ଆମାର ଘାଡ଼େ ଆର ଗାଲେ ତୋମାର ଘାମ ଲେଗେଛିଲ, ଏଥିମୋ ଶ୍ପଷ୍ଟ ଟେର ପାଇଁ ।’ ଏଥନ ବଲଛି, ଆର ଏଥିମୋ ମେହି ଶ୍ପର୍ଶ ଶିରଶିର କରଛେ, ଏହି ଆମାର ଅଭିଜ୍ଞତା ।’

ଫୁଲରାର ଚୋଥ କମଲେର ଚୋଥେର ଓପର । କମଲେର ଅବାକ ଡ୍ଲାନ ଚୋଥେ ଅମୁସନ୍ଧିଂମା । ଫୁଲରାର ମନେ ହଲୋ, ଓର ବୁକେର କାହେ ନିଶାସ ଆଟିକେ ଆସଛେ । ଏଥନ ଓର ମନ ଚକିତେଇ ଉଜାନେ ଫିରେଛେ, ଆର ତାର ଏକଟା ତୈବ ଟାନ ଓର ପାଂଜରେ ଲାଗଛେ । ଆଣ୍ଟି ଆର ଅପରାଧବୋଧ ଆର ଶୃତି ଏକମେଳେ ଓକେ ଉଜାନେ ଠେଲେ ଦିଯେଛେ । ଓ ଠୋଟେ ଠୋଟ ଟିପଲୋ, ବୁଝିତେ ପାରଛେ, ଓର ଚୋଥେ ଜଳ ଆସଛେ ।

‘କେନ ରାଗ କରିଲେ ?’ କମଲେର ସ୍ଵରେ ଏଥିମୋ ଆହତ ବିଶ୍ୱଯ ।

ଫୁଲରା ଆର ତାକିଯେ ଥାକିତେ ପାରିଲୋ ନା, କମଲେର ଚୋଥ ଥେକେ ଚୋଥ ମରିଯେ, ମୁଖ ନାମାଲୋ । ଦୃଷ୍ଟି କୃତ ବାପଦା ହେଁ ଉଠିଛେ । କମଲେର କୋମରେର

কাছে স্পর্শিত ওর হাত নেমে গেল, কমলের কোলের কাছে জামার
অংশ মুঠি পাকিয়ে ধরলো।

কমল ফুলরার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো। ওর ব্যক্তিকে
চোখে শুপর দিয়ে, কয়েকটা পর্দা যেন নিমেষে সরে যেতে লাগলো।
সহজ হয়ে উঠলো আড়ষ্ট হাসি, ঘান ছায়া কেটে গেল। মুখ ফিরিয়ে
দেখলো, ওর জামা মুঠি করে ধরা ফুলরার হাত। পর মুহূর্তেই ও কেমন
সচেতন হয়ে উঠলো, সোজা তাকালো কুমারের দিকে। কুমার তার
অপলক দৃষ্টি ফেবান্দার সময় পেলো না, খুব অপ্রস্তুত হয়ে উঠলো।
কমল তু পাশ ঢাকা ঠুলিটা এঁটে নিল চোখে। কিছু না বলে, ওর
ঠুলি চোখ ফুলরাকে আর একবার দেখে, আবার ফিরলো জামা ধরা
মুঠির দিকে। ওর হাত একবারেব জন্য ফুলরার মুঠির দিকে নেমে
আসতে গিয়ে থমকিয়ে গেল, সামনের আসনের পিছনের রাডে রাখলো।

সময় বয়ে যেতে লাগলো। দু পাশের মাঠে, দূরের আবছা বনে
গর্জন ছড়িয়ে দিয়ে বাস ছুটছে। কোনো কোনো আসনে নানা কথাব
টুকরো। ফুলরাব সাম প্লাসের ফ্রেমে জলের ফোটা ঠেকে আছে, এখনো
মুখ তুলতে পারছে না। বিস্মিতির পর্দা কমলের কথার ছুরিতে ফালা
ফালা। অথচ ও মনে করেছিল, স্বাভাবিক ভাবেই কমলকে ভুলে
গিয়েছিল। কমলের অস্তিত্ব অবাস্তব হয়ে উঠেছিল। মিথ্যা ধারণা
আর বিশ্বাস, সামাজ্য কথাতেই কৌ রকম ভেঙে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে যায়।
ওর মনে, অপরাধবোধ এখন একটা বিরাট লজ্জা হয়ে উঠেছে আর
কমলের মতোই ওর সারা গায়ে শিরশির করছে, আর সমস্ত ঘরটা
আবেগে থরথর করছে। কমলকে এখন ও কৌ বলবে?

‘তু-এক মাস আগেও, এসব কথা এভাবে বলা আমার নিজের
কাছেও খুব নিন্দনীয় ছিল।’ কমল ওর মেই বিশিষ্ট নিচু স্বরে বললো,
‘আসলে আমি জীবনের অনেক কিছুকেই মূল্যহীন বলে ধরে নিতে
শিখেছিলাম। ইভ্যানজেলের মতো, পবিত্র সব বাণী। এরকম প্রটেস্টেন্ট
হ্বার কোনো অর্থ নেই। যতটা সন্তুষ পুরোপুরি একটা মাঝুষ, কোনো

বড় কাঞ্জ-টাঙ্গ করতে পারে, রক্ষা করা, হত্যা করা, সব কিছু বোধ হয় তারাই করতে পারে। আন্কমন হবো বলে কেউ তা হতে পারে না, তাই না? কমনসেল হচ্ছে প্রেটার সেল, তাই তো, না কী?

ফুল্লরা কমলকে দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো। কমল কথা বলছে। কেন বলছে, কী বলছে, ও কিছুই ঠিক বুঝতে পারছে না। ও ঠিক আগের মতো কথা বলছে। আগে ওর ভাবনা-চিন্তার কথা যেরকম বলতো, আর সব কথাতেই একটা জিজ্ঞাসা, অন্তের মতামতকে জানতে চাওয়া। ফুল্লরা ওর দিকে ফিরে তাকালো। কমল হাসছে, আর ওর চোখের কালো ঠুলিতে কেমন একটা কৌতুকের ঝিলিক। বললো, ‘তোমার সানগ্লাস মোছ?’

ফুল্লরাব মুখে আবার শঙ্গার ছটা লেগে গেল। কমলের জামা মুঠি করে ধরা হাতটা তুলে, তাড়াতাড়ি সানগ্লাস খুললো। মুখ নামিয়ে, ঝাঁচল দিয়ে চেপে চেপে চোখ মুছলো, আর চোখের কোল। কমল আসলে ওকে চোখ মুছতেই বলেছে, উচ্চারণ করেছে সানগ্লাস। তবু ও সানগ্লাসটাও মুছলো, কিন্তু তৎক্ষণাং মুখ তুলে, সহজভাবে তাকাতে পারলো না।

কমল আবার বললো, ‘এসব কথা ধাক। আসলে আমি কী বলতে যাচ্ছিলাম জানো?’

ফুল্লরা মুখ তুলে তাকালো। কমল হেসে বললো, ‘তুমি যে তখন বলছিলে, আমি আমার অভিজ্ঞতার বিষয়ে মিথ্যা কথা বলছি, সেটা ঠিকই বলেছ। শ্বেদসিক্ত রমণীর অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভালোই আছে।’

ফুল্লরার ভুক্ত জোড়া অবাক জিজ্ঞাসায় একবার কেঁপে উঠলো। কমলের কালো ঠুলির দিকে তাকালো। কমল বললো, ‘শান্তিনিকেতনে বেলুদিদের বাড়িতে—’

ফুল্লরার মুখে গাঢ়-রক্তাভা ছড়িয়ে পড়লো। ও ভুল করে, প্রায় কমলের নাম ধরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিল। কোনোরকমে উচ্চারণ

করলো, ‘ঘাত !’ তারপরে মুখ নামিয়ে নিল। ‘আর মনে হলো, ওর স্বেদাক্ত খোলা বুকে, কমলের তপ্ত গাল চেপে রাখা রয়েছে। ওর সারা গায়ে একটা শিহরণের তরঙ্গ বয়ে যেতে লাগলো। এসব কী আশ্চর্য ব্যাপার, আর অবিশ্বাস ! কমল এখনো সেই সব কথা মনে রেখেছে। ফুল্লরার ধারণা ছিল, ও নিজেই সব ভুলে গিয়েছে। অথচ উচ্চারণের অপেক্ষা মাত্র, সবই কেমন তীব্র বাস্তবতায় ওকে আচ্ছন্ন করে তুলছে। ওর নিজের কাছেও, জীবনের সেটা একটা বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা। কিন্তু এসব কথা মনে রেখে ও বলেনি, কমল মিথ্যা কথা বলছে। কিংবা এসবই হয়তো শুর অবচেতনে ছিল, আর তা-ই খুব জোরের সঙ্গে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, কমল মিথ্যা কথা বলছে।

গাড়িটার গতি কি মন্ত্র হয়ে আসছে ? তবু ফুল্লরা কোনো দিকে ভাকিয়ে দেখলো না। শাস্তিনিকেতনে, বেলুদির বাড়ির সেই আশ্চর্য অলৌকিক দুপুরের কথা, ওর সমস্ত সূতি উন্মাদিত করে ভেসে উঠলো। ঝুপার জন্মদিনের এক মাস পরের ঘটনা সেটা। ছাদের সেই ঘটনার পরে, মাত্র কয়েকটা দিনই একটু হালকা হাসি ঠাট্টায় কেটেছিল। ফুল্লরা বিমান সম্পর্কে ওর মনোভাবের কথা কমলকে বলেছিল, খুব স্পষ্ট ভাবেই বলেছিল, বিমানকে ও যা মনে করেছিল, তার কিছুই শুর মধ্যে ছিল না। ও জোর করে বিশ্বাস করতে চেয়েছিল, বিমানের মধ্যে একটা বিরাট সন্তাননা রয়েছে। ওর মনে যখন পূর্ণ মাত্রায় অবিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছিল, তখনো ও নিজের বিরংদ্বৈ প্রতিবাদ করেছে। কারণ, বিমানের ব্যর্থতা, অনেকটা যেন ওর নিজের পরাজয় বলে মনে হয়েছিল। ও যখন অভুত করেছিল, বিমানকে ও ভালবাসে না, তখনো বিমানের সমস্ত ইচ্ছাকে ও মেটাতে দিয়েছে।

কমল প্রথমে বিশ্বাস করতে চায়নি, পরিষ্কার হেসে বলেছিল, ‘তোমার মুখ থেকে একথা শুনে, শ্রেফ একটা স্টাটের মতো লাগছে !’

‘কিন্তু যা সত্যি, তাই তোমাকে বললাম !’ ফুল্লরা বলেছিল, ‘স্টাট

তোমাকে না, আমি আমার নিজেকেই এতদিন স্টান্ট দিয়ে এসেছি।
আসলে সবটাই ছিল আমার মনগড়া। ব্যাপারটা সব আমারই।
এক ধরনের সেলফ-হিপনোটিজম্ বলতে পারো। বিমানের তাঁতে
কোনো কিছুই ছিল না। ওব যা নেবার, ও তা নিচ্ছিল, বোধ হয়
ভাবছিল, ও অনেক কিছু আমার কাছ থেকে নিয়ে নিচ্ছে। আমরা
মেয়েরাও তো তাই ভাবি। ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে গেলে, আর সেটাকে
যদি প্রেম মনে করি। তার জন্য একটা ছেলেকে যা দিতে হয়, সেটাকে
তো অনেক কিছু দেওয়াই বলে। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন আর
কিছুতই মিথ্যাকে চাপা দিয়ে বাধা যাব না। আর সেটাই তো ঘটলো
কপাদের ছাদে।’

কমল অবাক ঢোখে তা কয়ে বলেছিল, ‘অথচ, আমরা দোতলায়
সবাই তোমাদের হজনকে নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তোমাদের
হজনকে আমরা সুযোগ দিতে চেয়েছিলাম। নেহাত কপার মা দোতলায়
এসে পড়েছিলেন বলে, আমি তোমাদের ডাকতে গিয়েছিলাম।
কুপাই আমাকে চুপিচুপি তোমাদের ডেকে আনতে বলেছিল।’

‘আর তুমি যদি তখন না যেতে, তাহলে একটা যাচ্ছেতাই ঘটনা
ঘটে যেতো।’ ফুলরা বলেছিল। ‘বিখান ওব নিজেব তুল বুঝতে পারতো
না, ভাবতো আমি লজ্জা পেয়েছি, আর ওব রাইট আছে ভেবে, একটা
বিশ্রী কাণ্ড করতো।’

কমল কেমন উৎসুক কৌতুহলে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘বিশ্রী কাণ্ড কী
ঘটতো?’

‘কী ঘটতো না?’ ফুলরা বলেছিল, ‘ওকে আমার কামড়ে খিমচে
দিতে হতো, আমাৰ জামাকাপড় ছিঁড়ে লুটোপুটি যেতো, আর আমার
চিংকারে কুপাদের বাড়িৰ সবাই এসে পড়তো।’

কমল বলেছিল, ‘অথচ আমি নিজেই কতোদিন দেখেছি, বিমানকে
পেলে, তুমি আর কোনো দিকে ফিরে তাকাতে না। তোমাদের
হজনকে নিয়ে আমরা সবাই এক কথা বলতাম, আর ভাবতাম,

তোমাদের বিয়ে হবে। আর সেইজন্ত তোমাকে আমরা সব সময় আলাদা চোখে দেখতাম।'

'তোমাদের কোনো দোষ ছিল না।' ফুল্লরা বলেছিল, 'আমি নিজেকেই যে সেরকম ভাবতাম, তোমাদের আর কৌ উপায় ছিল।'

কমল হেসে বলেছিল, 'আশ্চর্য, তোমাদের সত্য মিথ্যা কিছু বোঝবার উপায় নেই। এটা তো ভারি মুশকিলের কথা।'

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন ?'

'কেন নয় ?' কমল বলেছিল, 'অনেকদিন ধরে জানলাম, একটা মেয়ে আমাকে ভালবাসে, তারপরে হঠাত একদিন সে দাত বসিয়ে কামড়ে দিল।'

ফুল্লরা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, 'তা সেই মেয়েটাকে যদি ভূমি বুঝতে না পারো, আগাগোড়াই ভুল করে যাও, হঠাত এরকম ঘটতে পারে। বিমানের তো শসব বোঝাবুঝির কোনো দায়ই ছিল না।'

'তুমিও বুঝতে দাওনি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'আর কৌ ভাবে বুঝতে দেওয়া যায় ? একটা মেয়ে 'আর কৌ ভাবে বুঝতে দিতে পারে ?'

'কিন্তু সেলফ-হিপনোটিজম ব্যাপারটা একটু এ্যাবনরমাল নয় কৌ ?' কমল ভুক্ত কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, 'হতে পারে। কিন্তু সব সময়েই অবিশ্বাস ঠিক না। নিজেকে বোঝাবার দরকার হয়, আমি হয়তো ভুল করছি। আমি হয়তো বুঝতে পারছি না।'

'তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ, কিন্তু আমি খুব বোকা বনে গেছি।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে ?'

'তার মানে, ঠকে গেছি, তাই না ?' কমল স্বাত কাত করে বলেছিল, 'আমরা কেউ তোমার সঙ্গে ধনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করিনি।'

ফুলরা হেসে উঠে বলেছিল, ‘এখন থেকে করবে নাকি ?’

‘তা একটু চেষ্টা করে দেখতে দোষ কৌ ?’ কমল গন্তীর স্বরে
বলেছিল।

ফুলরা খিলখিল করে হেসে উঠে, হাত তুলেছিল। কমল তাড়াতাড়ি
মাথাটা সরিয়ে নিয়েছিল। তখন তো সব ছেলেমেয়ের মধ্যেই একটু
প্রেম প্রেম খেলা ছিল। যদিও সে-সব সৌরিয়াস কিছু না। কিন্তু খেলা,
হাসি সব কিছু ছাড়িয়ে, কমলের অবস্থান বদলিয়ে গিয়েছিল। ফুলরা
সম্যক কিছু বুঝে উঠার আগেই, কমল খুব নিবিড় করে এগিয়ে
আসছিল, আর ফুলরা তা প্রথম বুঝতে পেরেছিল, ওর প্রতি কমলের
নিবিড় অমুসন্ধিংসা থেকে। শাস্তিনিকেতনে পূর্ব পল্লীতে বেলুদির
বাড়ির এক অলৌকিক দৃশ্যে, এক নির্বাক নৈঃশব্দে সেই অমুসন্ধিংসা
ফুটে উঠেছিল।

॥ চোদ ॥

বেলুদি শ্যামলের দিদি । শ্যামল ফুলরাদের বন্ধু । ফুলরা যখন কমলের
সঙ্গে শান্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল, তার মাত্র
মাস ছয়েক আগে বেলুদি বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবনে চাকরি নিয়ে
কলকাতা থেকে চলে গিয়েছিলেন । ঘটনাটা ফুলরাদের কাছে ছিল
কিছুটা অবাক—চমক লাগানো । বেলুদি আর শিবতোষদা—বেলুদির
স্বামী, ছজনে কলকাতার একই কো-এডুকেশান কলেজে পড়াতেন ।
বেলুদির একমাত্র সন্তান, একটি মেয়ে তখনো ইঞ্জিলের উচু ক্লাসে
পড়তো । শ্যামলও বেলুদির প্রায় সন্তানের মতোই । বেলুদির দুই
দাদা থাকতেও, পিতৃমাতৃহীন ভাইটির দায়িত্ব ছেলেবেলা থেকে তিনিই
নিয়েছিলেন ।

বেলুদির সঙ্গে ফুলরা আর ওদের গ্রুপের সব ছেলে ও মেয়ে বন্ধুদের
যোগসূত্র শ্যামল । বেলুদির বাড়িতে শ্যামলের বন্ধুদের সকলেরই
অবাধ গতি ছিল । সঙ্গে শ্যামল না থাকলেও, যাতায়াতের কোনো
অসুবিধা ছিল না । ফুলরাদের মনে হতো, যে-কোনো সময়ই বেলুদি
যেন ওদের পথ চেয়ে বসে আছেন । আসলে বেলুদি ঠার অবকাশের
যে-কোনো সময়েই ফুলরাদের সঙ্গে গান করে, গল্প করে কাটিয়ে দিতে
ভালবাসতেন । শিবতোষদাও বাদ যেতেন না । বেলুদির মেয়ে চলনা
তো নয়-ই । তবে হাসি হাসি মুখ, ভারি চেহারার শিবতোষদা কথাবার্তা
কর বলতেন । অথচ মাঝে মাঝে এমন হাসির গল্প বলতেন, ভাবাই
যেতো না, শিবতোষদার মতো সোকের ভিতরে এতো হাসি-উচ্ছল-
সরসতা আছে ।

তুলনায় বেলুদি প্রচুর কথা বলতেন, অজস্র হাসতেন, তার মধ্যেই ছুটে ছুটে কাজও করতেন, কিন্তু এক এক সময় ঠাঁর হাসির মধ্যেই, কোথায় একটা গান্ধীর্থের স্বর ফুটে উঠতো, আর খুব সৌরিয়াস কথা, খুব সহজভাবে বলতেন। ঠাঁর কিছু কিছু কথা এখনো ফুল্লরার কানে লেগে আছে। “তোমরা যে-যাই ইজম টিজম নিয়ে থাকো, আমার কিছু বলবার নেই, কিন্তু কোনো বিষয়েই প্রাভারেজ না হওয়ার চেষ্টা করো। তা সে রাজনীতি করো, গান করো, কবিতা লেখ বা মাঠে ময়দানে খেলতে যাও। জীবনটা অন্যায়ে বয়ে যাবে, এরকম ভাবাটাই ভুল,” ...“যার বিশ্বাস নেই, তার কিছুই নেই। ঈশ্বরে হোক, অথবা নিরাশৰ বস্ত্ববাদী হও, হিংসা-আহংসা, যাই বলো, বিশ্বাস একটা থাকা চাই।” ...“উদ্দেশ্যহীন লেখাপড়া করার থেকে না-করা অনেক ভালো। আর উদ্দেশ্য যদি কেবল শিক্ষা না হয়ে চাকবির জন্য হয়, তা হলে চুরি না করে উপায় নেই। শটা একটা শৃঙ্গ ব্যাপার। নামেই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ানো, আসলে অশিক্ষিত সাধারণ অদক্ষ মজুর ছাড়া শুরা কিছুই নয়।”...“রাজনীতি করা আর মানব-দরদী হওয়া এক কথা নয়।”

বেলুদি নানা কথাপ্রসঙ্গেই এই ধরনের কথা বলতেন। বিশেষ-ভাবে ভেবে চিন্তা করে কিছু বলতেন না। কথাগুলো ফুল্লরার মনে থাকার কি কারণ? বেলুদির কোনো কথাই কি ওর জীবনে কাজে লেগেছে? বুঝতে পারে না। কিন্তু একটা বিষয় ও বুঝতে পারতো। বেলুদি ছিলেন ঈশ্বরে গভীর বিশ্বাসী, আর একেবারে বিপরীত ছিল শ্যামল। ওর কোনোরকম ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না। ফলে, বেলুদির সঙ্গে সব থেকে বেশি তর্ক লাগতো শ্যামলেরই। শিবতোষদাকে ঠিক মতো বোঝা যেতো না। কারণ তিনি কখনো তর্কে যোগ দিতেন না।

বেলুদি পড়াশোনা করেছিলেন শাস্তিনিকেতনে। ছুটি-ছাটায় প্রায়ই বেলুদি আর শিবতোষদা, চন্দনাকে নিয়ে শাস্তিনিকেতনে যেতেন। তা

ছাড়া শাস্তিনিকেতনের বিশেষ কয়েকটি উৎসবে তো যেতেনই। ব্যতি-
ক্রম ছিল শ্যামল। ওর শাস্তিনিকেতনের প্রতি তেমন আকর্ষণ ছিল না।
অথচ ফুলরা ছাড়া, ওদের বন্ধুরা সকলেই কোনো না কোনো উপলক্ষে,
তু একবার অস্তুতঃ বেলুদির সঙ্গে শাস্তিনিকেতনে গিয়েছে। শ্যামলের
মতো কোনো বিরাগ ওর ছিল না। নিতাস্তই কোনো না কোনো
কারণে বাধা পড়েছে, যাওয়া হয়নি, আর বন্ধুদের কাছে শাস্তি-
নিকেতনের গন্ধ শুনে, ওর মন খুব খারাপ হয়ে যেতো।

বেলুদির বাবা শাস্তিনিকেতনের পূর্বপঞ্জীতে একটি বাড়ি করে-
ছিলেন। বিশ্বভারতীর কাজকর্মের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগাযোগ ছিল
না। বিপদ্ধীক ভজ্জলোক রবীন্দ্র-প্রেমিক ছিলেন, শাস্তিনিকেতনকে
ভালবাসতেন। সরকারি পদস্থ চাকরি থেকে অবসরের পর, শাস্তি-
নিকেতনে বাড়ি করে, বাকি জীবনটা কাটিয়েছিলেন। নিজেদের বাড়ি
থাকাতেই বেলুদিদের যখন তখন যাওয়ার সুবিধা ছিল। বাড়িটা
কখনো ভাড়া দেওয়া হয়নি।

কিন্তু কলকাতা কলেজের চাকরি ছেড়ে, বেলুদির শাস্তিনিকেতনের
চাকরির চেষ্টা বা সিদ্ধান্ত করে কৌ ভাবে নেওয়া হয়েছিল, ফুলরারা
কিছুই জানতে পারে নি। শ্যামলও ওদের কিছু বলেনি। কোথাও
একটা কিছু গোলমাল ঘটেছিল, সন্দেহ নেই। কারণ শিবতোষদা
শ্যামলকে নিয়ে থাকবেন কলকাতায়, আর বেলুদি চন্দনাকে নিয়ে
থাকবেন শাস্তিনিকেতনে। ভেবেই ফুলরার মনে অস্বস্তি হয়েছিল।
অস্বস্তি হয়েছিল, ওদের সব বন্ধুদেরই। গোলমালের সন্দেহটা বাড়িয়ে
দিয়েছিল শ্যামলই, বন্ধুদের কাছে বিষয়টি নিয়ে একটি কথাও না বলে।
শ্যামল এমন একটা ভাব করেছিল। যেন ও কিছুই জানে না।
বলবার মতো ঘটেনি কিছুই। যেন খুবই একটা সহজ ব্যাপার।

বেলুদি অবিশ্ব সেইরকম ভাবই দেখিয়েছিলেন। তিনি তাঁর
মতো হেসে বলেছিলেন, ‘পাথরপুরী কলকাতা ছেড়ে এবার শাস্তি-
নিকেতনে। সেখানে তোমাদের রোজ নিম্নোক্ত। যেদিন খুশি, যখন

শুশি, যতোজন খুশি। ঠিক কলকাতার মতোই। চোখের বাইরে
চলে গেলেই যেন, বেলুদি তোমাদের মনের বাইরে না চলে যাও।’
শ্বেতের কথাটা বলার সময় কি বেলুদির গলা একটু ধরে এসেছিল?
বোধহয়। কিংবা ফুলরার নিজেরই গলার কাছে কিছু ঠেকে গিয়েছিল।
আশ্চর্য, শিবতোষদাও তখন তাঁর অভাবসিদ্ধ যত্ন হেসে বলেছিলেন,
'তোমাদের শিবতোষদাকে যেন তা বলে একেবারে নির্বাসন দিও না।
তোমাদের দেবার মতো আমার ভাণ্ডারেও কিছু আছে।'

বেলুদি খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিলেন, ‘সত্যি, আমি একটু
একচোখোমি করে ফেলাম। এ বাড়িটাই তো আদি। অবিশ্বি
গ্রামল থাকছে কলকাতায়, ওর সঙ্গে তো তোমরা এ বাড়িতে
আসবেই। আমি একটু দূরে চলে যাচ্ছি বলেই বললাম।’

শ্যামল সামনে থেকেও, দিদি ভগ্নিপতির কথায় কোনোরকম মন্তব্য
করেনি। বেলুদি আর শিবতোষদার হাসি, কথাবার্তায় বোৰা-ই যায়নি,
হৃজনের মধ্যে কোথাও একটা কিছু গোলমাল ঘটেছে। অবিশ্বি
লোক-দেখানো প্রেমে ডগমগ দম্পতি তাঁরা কোনোকালেই ছিলেন না।
কিন্তু একজনের কম কথা, আর একজনের অনেক, একজনের স্বল্প হাসি,
আর একজনের কম কলকলানো, একজনের দৃষ্টি অচঞ্চল গভীর, আর
একজনের বিদ্যুৎবিচ্ছুরিত চঞ্চল, যদিও অগভীর বলা যাবে না কোনো
মতেই, তাঁদের মধ্যে যে একটা পারম্পরিক বোৰাপড়া ছিল—
যাকে বলে আণুরস্ট্যান্ডিং, সেটা পরিষ্কার বোৰা যেতো। তাঁদের
ছাড়া-ছাড়ির দিনেও বিপরাত কিছু বোৰা যায়নি। ফুলরার কাছে
সেটাই এক অবাক-জিজ্ঞাসা।

সেই থেকেই, ফুলরাদের কখনো দল বেঁধে, কখনো জোড়ায় বা
একা শাস্তিনিকেতনে বেলুদির বাড়ি ঘাণ্ডার শুরু। ফুলরা কখনো
দলের সঙ্গে ঘাণ্ডার স্বৰূপ করে উঠতে পারেনি। একবারই গিয়েছিল,
কমলের সঙ্গে। গ্রীষ্মের ছুটির আকাশে, কমল হঠাতে প্রস্তাবটা
তুলেছিল, ‘চলো ফুলরা, বেলুদির ওখানে ছটে দিন ঘূরে আসি।

সকলেরই কয়েক দফা করে যাওয়া-আসা হয়ে গেল, তোমার আর আমারই হয়নি।'

ফুল্লরা এক কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল। ও জানতো, গ্রীষ্মের ছুটিতে ওকে দেশের বাড়িতে যেতে হবে। অবিশ্বি, দিনি আর কুমারদাব অনুমতির দরকার ছিল। দিনির থেকে কুমারদা-ই একটু বেশি সাবধান। তবু অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ওদের দুজনকে দেখে, বেলুদি খুব খুশ হয়েছিলেন। চন্দনা এক পাক নেচে নিয়েছিল।

বেলুদি আর চন্দনা ছাড়া, বাড়িতে ছিল এক সাঁওতাল দম্পতি। বাড়ির পিছন দিকে তাদের দেড়খানি মাটির ঘরের সংসার ছিল। তারাই বেলুদির বাড়ি, এমনকি ঘরকলাও দেখাশোনা করতো। বেলুদি একবার সকালে, আর একবার ঘোর হৃপুরে পড়াতে যেতেন। চন্দনার এগারোটায় ছুটি হয়ে যেতো। বেলুদি বিকালে ফিরে এলেই আসর জমতো। গল্লের আসর, বেড়াতে যাবার উদ্বাদন। ছুটো দিন কেটেছিল, নতুন প্রকৃতির দূরস্পষ্টী গভীরতায়, ঝর্নার মতো কলকল বেগে।

ফুল্লরা আর কমল দুদিন ছিল। তৃতীয়দিন তোরের ট্রেনে ফিরে এসেছিল কলকাতায়। কমলের নিবিড় করে এগিয়ে আসাটা অতি প্রজ্যক্ষ হয়ে উঠেছিল, ফিরে আসার আগের দিন হৃপুরে। ইংরেজী মতে সেটা হয়তো অপরাহ্ন। কিন্তু আসলে পূর্বপল্লীর বৈশাখের বেলা তখন তিনটা। সবুজ আর রক্তাভ রাঢ়ের সেই সময়টাকেই বোধহয় নিদাঘ হৃপুর বলা যায়।

সেই নিদাঘ হৃপুরের কি কোনো মায়া আছে? বক্ষ দরজা-জানালার শুপর মোটা পর্দা, প্রায় অঙ্ককার ঘরের মাথার ওপরে ছুরুন্ত বেগে ঘূরছিল সিলিং ফ্যান্ট। খাটের বিছানায় ফুল্লরার পাশে শুয়ে চন্দনা অঞ্চলে ঘুমোছিল। পাখা জোরে ঘূরছিল, তবু চন্দনার গলায় আর চিবুকে ঘাম চিকচিক করছিল। ঘামছিল ফুল্লরাও। ঘরের

ভিতর বাতাসেও উত্তাপ ছিল। বাইরেও একটা ঝোড়ো বাতাসের দাগাদাপি চলছিল। বন্ধ জানালায় মাঝে মাঝে তার বাপটা লাগছিল। যেন হপুরের রাঢ়ের পাগলা বাতাস ঘরে চুক্তে চাইছিল। পাশের ঘরে কমল কি করছে? ফুলরার মনে কেমন অকারণেই প্রশংস্টা জেগেছিল। আগের দিন হপুরেও কমল, একই ঘরের মেবেয় একটা মাহুর পেতে পাথার নিচে শুয়েছিল। কমলকে সেই প্রথম ফুলরা খালি গায়ে দেখেছিল। রাঢ়ের শুকনো উত্তাপেও আজ্ঞাতা ছিল। কমলও ঘেমেছিল, আর অঘোবে ঘুমিয়ে পড়লেই ঘামের শ্রোত যেন কলকলিয়ে বহে।

কিন্তু দ্বিতীয় দিন কমল এক ঘরে ছিল না। পাশের ঘরে ছিল। কেন, কৌ কবেছিল কমল? ঘুমন্ত ঘর্মাঙ্গ চন্দনার পাশে নিজের ঘর্মাঙ্গ অর্থচ জাগ্রত অবস্থায় জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল। কমল কি কিছু পড়াশুনা করছিল? দারুণ হপুরে, ও কি পাশের ঘরের জানালাগুলো খুলে ঘুমোচ্ছিল? কেনই বা জিজ্ঞাসাটা মনে এসেছিল? একান্তই একাকীহের জন্ম, না কি কমলের অভাববোধ? অথবা নিতান্তই রাঢ়ের সেই দারুণ তাপদক্ষ ঝটিকা-গ্রামত হপুরের মাঝা!

মনে জিজ্ঞাসার মুহূর্তেই, পাশের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে গিয়েছিল। সামান্য শব্দেই ফুলরা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছিল। আবছা অঙ্ককারে, দরজার মাঝখানে, পায়জামা পরা খালি গা কমলকে দেখেই চিনতে পেরেছিল। ফুলরা মাথাটা তুলেছিল। কমলের নিচু স্বর শোনা গিয়েছিল, ‘ঘুমোচ্ছিলে নাকি?’

ফুলরা উঠে বসেছিল। বুকের এলানো আঁচলটা টেনে দিয়ে, একবার ঘুমন্ত চন্দনাকে দেখে বলেছিল, ‘না। কিছু বলছো?’

‘চন্দন! ঘুমোচ্ছে?’ কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুলরা বলেছিল, ‘হ্যাঁ। কিছু বলছো?’

কমল যেন ভেবে পাচ্ছিল না, কি জবাব দেবে! কয়েক মুহূর্ত চুপ করে, অফট উচ্চারণে বলেছিল, ‘না।’ বলেই পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।

ফুল্লরা বসে থাকতে পারেনি। কমল 'না' অথবা 'হ্যাঁ' কি বলেছিল, বুঝতে পারেনি, অথবা কি একটা অমোৰ শক্তি যেন ওকে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য! পাশের ঘরে ঠিক মাঝখানে, কমল ভূতগ্রন্থের মতো দাঢ়িয়েছিল। আবছা অক্কারের মধ্যেও ওরা পরম্পরকে দেখতে পাচ্ছিল। সেই আবছা অক্কারেও কমলের সারা গা ঘামে চকচক কৱছিল। ওর চুল লুটিয়ে পড়েছিল কপালে। মাথার ওপরে ঘূর্ণন্ত পাখার বাতাসেও মাথার চুলগুলো উড়েছিল। ঘামে চকচকে শরীরের মতোই, ওর চোখ ছটোও যেন চকচক কৱছিল, অবাক অপ্রস্তুত চোখে ফুল্লরার দিকে তাকিয়েছিল। বলেছিল, 'উঠে এলে ?'

ফুল্লরা ভবাব দিয়েছিল, 'তুমি কৌ বলে এলে, বুঝতে পারলাম না।' 'দেখতে গেছলাম, তুমি ঘুমোছ কৌ না।' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের কাছে এগিয়ে গিয়েছিল, 'বললাম তো ঘুমোইনি। তুমি আজ এ ঘরে গেলে না কেন? কি কৱছিলে এ ঘরে, একলা একলা ?'

'কি আবার কৱবো ?' কমল হেসে উঠেছিল। 'আমিও ঘুমোবাৰ চেষ্টা কৱছিলাম।'

ফুল্লরার মনে হয়েছিল, কমল যেন স্বাভাৱিক নেই। ওর কি জোৱে জোৱে নিষ্পাস পড়েছিল? ফুল্লরা ওর গায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুমি কল্কল কৱে ঘামছো ?'

'তোমাৰ মুখেও ঘাম !' কমল বলেছিল।

ফুল্লরা শাড়িৰ আঁচল দিয়ে নিজেৰ গলা আৱ মুখ মুছতে মুছতে বলেছিল, 'হ্যাঁ, ঘামছি তো। এত জোৱে পাখা চালিয়েও ঘামছি। আমি ভেবেছিলাম এখানকাৰ গৱামে ঘাম হয় না। তুমি তো যেন চান কৱে উঠেছো। তোমাকে মুছিয়ে দেবো ?'

'মুছিয়ে দেবে ?' কমল এমনভাৱে বলেছিল, যেন জিজ্ঞাসা না, অপ্পেৰ ঘোৱে কথা বলছে।

কমলেৰ গায়েৰ দিকে তাকিয়ে ফুল্লরা যেন নিজেৰ ভিতৰে কেমন

একটা অস্থির-ব্যগ্রতা অশুভব করছিল, বলেছিল, ‘ইঠা মুছিয়ে দিই’।
বলে ও আবার জিজ্ঞেস করেছিল, ‘দেবো, আমার আঁচল দিয়ে ?’

কমল কিছু না বলে, ফুল্লরার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। ফুল্লরা কমলের
গাঁথে আঁচল চেপে চেপে ঘাম মুছিয়ে দিয়েছিল, আর কমল যেন এলিয়ে
পড়েছিল। ফুল্লরা বলেছিল, ‘আরে, শক্ত হয়ে দাঢ়াও না !’

কমল তখন ফুল্লরার কাঁধে হাত দিয়ে চেপে ধরে দাঢ়িয়েছিল।
ফুল্লরাও তখন কমলের ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে চেপে ধরে বলেছিল,
‘আমারই ভুল। ধরে না মোছালে, মোছানো যায় না। উহু, তোমার
নিষ্পাস কৌ গরম !’

‘তোমারও !’ কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, ‘কিন্তু তোমার গা-টা ভারি ঠাণ্ডা !’

‘তোমারও !’ কমল আবার বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চোখের দিকে তাকিয়েছিল। কমলের চোখে যেন
হাঙ্গারটা অবাক জিজ্ঞাসা। ফুল্লরা বলেছিল, ‘তোমার কৌ হয়েছে
বলো তো ?’

‘আমার ?’ কমল ঢোক গিলে, বোকার মতো হেসেছিল, বলেছিল,
‘এ ঘরে একলা থাকতে থাকতে, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে
করছিল !’

হঠাৎ চেউয়ের মতো, ফুল্লরার ঝুকের পাড়ে যেন একটা ঝাপটা
লেগেছিল। ওর ঘাম মোছানো হাত থেমে গিয়েছিল। কমলের
চোখের দিকে তাকিয়েছিল। বিভাস্তি ওর মনে। বক্ষ ঘরের মধ্যেও
বাইরের ঝোড়ো বাতাসের শব্দ ভেসে আসছিল। কমল আবার ঝুঁকে
উঠেছিল, যেন একটা ঘোরের মধ্যেই, ‘আমি ভাবছিলাম, রূপাদের
বাড়ির ছাদে বিমান তোমাকে কৌ করতে চেয়েছিল ?’

ফুল্লরার বাঁ হাতটা কমলের ঘাড় থেকে খসে পড়েছিল, সন্দিক্ষ
স্থলিত ঘরে বলেছিল, ‘কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছো ? বিমান তো খুব
জন্মত্ব। নোংরামি করতে চেয়েছিল, কিন্তু তুমি— !’

কমল তৎক্ষণাতে কোনো জবাব দিতে পারেনি। ফুল্লরা হ'পা সরে গিয়েছিল। আর ওর কাঁধ থেকে কমলের হাতটা খসে পড়েছিল। ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কেন তুমি একথা জিজ্ঞেস করছো?’

‘জানি নে।’ কমল বলেছিল।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি বোঝ না, বিমান কী করতে চেয়েছিল?’

‘হ্যা, একরকম বুঝতে পারি।’ কমল ওর মেই ঘোর লাগা স্বরেই বলেছিল।

ফুল্লরা যেন সন্দেহ আর বিশ্বায়ে মরে যাচ্ছিল, জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তবু জিজ্ঞেস করছো কেন?’

‘কী জানি।’ কমল অকপট আবেগের স্বরে বলেছিল, ‘ঘটনাটা আমার মনে পড়েছিল। আর তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল।’

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করেছিল, ‘মেই ঘটনা মনে পড়েছিল বলে, আমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল তু?’

‘হ্যা। তা ছাড়াও দেখতে ইচ্ছে করছিল।’ কমল মুখটা ফিরিয়ে নিয়েছিল, সরে গিয়েছিল বিপরীত দিকে, বুক সেল্ফের কাছে, আর মুখ না ফিরিয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি আমার দিকে কেমন করে যেন তাকাচ্ছো। তুমি কি আমাকে বিমানের মতো ভাবছো নাকি?’

ফুল্লরার বুকের পাড়ে আবার একটা ঢেউয়ের বাপ্টা লেগেছিল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশ্বায়কর, কমলকে ভীষণ দুর্বোধ্য মনে হয়েছিল। মনে মনে কেমন একটা অশ্যায়বোধও জেগে উঠেছিল, বলেছিল, ‘না না, তোমাকে বিমানের মতো ভাববো কেন?’

কমল কোনো জবাব দেয়নি। ফুল্লরা আস্তে আস্তে কমলের সামনে গিয়ে দাঢ়িয়েছিল। কমল তাকিয়েছিল ওর চোখের দিকে। অভিমানী আর ছেলেমানুষের মতো দেখাচ্ছিল কমলকে। ছেলেমানুষ? ফুল্লরা নিজে কি খুব একটা বড় মানুষ ছিল নাকি! এখন ভাবলে হাসি পায়। কিন্তু মেয়েরা কোনো কোনো বিষয়ে, ছেলেদের থেকে সব

সময়েই বেশি অভিজ্ঞ। তথাপি কমলকে সেই সময়ে, পূর্বপল্লীর সেই দুপুরে ছর্বোধ্য লেগেছিল। বলেছিল, ‘তোমাকে—তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।’ সেটা কি আমার দোষ ?

‘আমিও বুঝতে পারছি না।’ কমল বলেছিল।

ফুলরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘কাকে ? আমাকে ?’

কমল মাথা নেড়ে হেসে বলেছিল, ‘না, আমাকে !’

ফুলরা আরও অবাক হয়েছিল। কমলের হাসি, কথা, সবই যেন ঠাট্টার মতো শুনিয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তার মানে কি ?’

‘আমিও জানি না, বিশ্বাস কর।’ কমলের স্বরে যেন কাতরতা ঝুটে উঠেছিল, ‘আমিও জানি না, কেন আমার ওরকম মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি সত্য বলছি।’

ফুলরার চোখে গভীর কৌতুহল আর জিজ্ঞাসা। ও তাকিয়েছিল কমলের চোখের দিকে। কমল তখন অন্তুভাবে মাথা নেড়ে হাসছিল, অবৰ বারে বারে বলেছিল, ‘দত্যি, কী আশচর্য, কেন আমার ওরকম মনে হচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছি না।’

ফুলরা কমলকে চিনতো, আর ও যে অকপট সরলভাবে কথাগুলো বলেছিল, কোনো সন্দেহ নেই। ফুলরারও হাসি পেয়েছিল, বলেছিল, ‘কমল, তোমাকে পাগলের মতো লাগছে।’

কমল হোহো করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল, ‘আমার নিজেরও তাই মনে হচ্ছে। আমি পাগল, পাগল ছাড়া কিছু নই।’

ফুলরা দেখেছিল, কমল আবার ঘামছে। ও নিজেও ঘামছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, ‘আর এখনো কি আমাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ?’

‘করছে তো।’ কমল অকপট আবেগে বলেছিল, ‘এ ঘরে একলা একলা তোমার কথাই খালি আমার মনে পড়ছিল। তারপরে হঠাত সেই ছাদের কথা মনে পড়ে গেল, আর ভাবলাম, বিমান তোমাকে কী করতে চেয়েছিল ? যেই মনে পড়লো, অমনি তোমাকে যেন আর না

দেখে থাকতে পারলাম না। আমি জানি না ফুলরা, সত্যি আমি জানি না, কেন আমার এরকম মনে হলো।'

ফুলরা কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি, কমলের চেথের দিকেই তাকিয়েছিল, আর শুরু বুকের পাড়ে যেন কমলের কথার সঙ্গে সঙ্গে বারে বারেই টেউয়ের ঘাপটা ছপাও ছপাও করে আচড়ে পড়েছিল। ওর রংগী চৈতন্যের কোন এক স্বদূর অঙ্ককারে যেন বিদ্যুৎ বলক খেলে গিয়েছিল। অনভিজ্ঞ নিষ্পাপ পুরুষের আবেগ, আগ্রহ, কৌতৃহল ও আত্মপ্রকাশের এক আশ্চর্য বিপরীত রূপকে যেন ও কমলের মধ্যে ফুটে উঠতে দেখোছিল, আর ও যেন লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

'ফুলরা!' কমল ডেকেছিল।

ফুলরা চোখ তুলে কমলের দিকে তাকিয়েছিল। লজ্জা আর আবেগ বনাত্তুত হয়ে উঠেছিল ওর মনে। বলেছিল, 'তুমি খুব ঘামছো আবার, এসো মুছিয়ে দিই।'

'না, আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' কমল ফুলরার আঁচলটা টেনে নিয়ে বলেছিল, 'তুমি আমার থেকে বেশি ঘামছো।' ও ফুলরার গলায় আর চিবুকে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিয়েছিল।

ফুলরা হেসে উঠেছিল, আঁচলটা কেড়ে নিয়ে বলেছিল, 'না না, আমাকে মোছাতে হবে না। আমি তোমাকে মুছিয়ে দিই।' ও কমলের গায়ে আঁচল চেপে ধরেছিল।

কমল আবার আঁচলটা কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু ফুলরা আঁচলটা তৎক্ষণাতে কেড়ে নিয়েছিল। তারপর কেবলই আঁচল কাঢ়াকাঢ়ি আর হাসাহাসি, এবং হঠাতে ফুলরা থেমে গিয়ে ডেকে উঠেছিল, 'কমল!'

কমল তাকিয়েছিল ফুলরার মুখের দিকে, চোখ রেখেছিল চোখে। কী ছিল ফুলরার চোখে? কমল হঠাতে নিচু হয়ে, ফুলরার গালে টোট দিয়ে একবার হাল্কা স্পর্শ করেই, ছুটে গিয়েছিল দরজার কাছে। ত্রুত হাতে ছিটকিনি খুলতেই, যেন এক ঝলক চোখ-ধূধানো আগুন, দরজায় ঝাপিয়ে পড়েছিল। কমল ছিটকে বাইরে গিয়ে, দৌড়ে

চলে গিয়েছিল। ফুল্লরা স্থির থাকতে পারে নি। ও ছুটে দরজার কাছে গিয়েছিল। বাইরে চোখ ঝলসানো রোদ আর বাতাসের ঝাপটাই বাগানের গাছপালাণ্ডলো যেন পাগলের মতো মাতামাতি করছিল। ফুল্লরার মনে হয়েছিল, বাতাসের তপ্ত হলকায় গা পুড়ে যাবে। ও ডেকেছিল, ‘কমল’।

কমলকে দেখা যাচ্ছিল না ফুল্লরা গেটের দিকে তাকিয়েছিল। গেট বন্ধ ছিল। ফুল্লরা মাথা ঢাকা বারান্দার প্রান্তে গিয়ে ঢাঢ়িয়ে, বাগানের চারদিকে তাকিয়ে দেখেছিল। বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে, ঝাড়লো কাগিনী গাছের আড়ালে, কমলের পায়জামার অংশ দেখা গিয়েছিল। ফুল্লরা ছুটে গয়েছিল সেখানে। কমল চমকিয়ে তাকিয়েছিল। ফুল্লরার চোখে তখন উদ্বেগ, ও নিজের মাথায় ঘোমটী ঢাকা দিয়ে বলেছিল, ‘বেলুদির কথা ভুলে গেছ ? এ হাওয়াটা একদম গায়ে লাগাতে নেই।’

‘হ্যাঁ, এ বাতাসকে লু এলে !’ কমল বলেছিল, ‘একটুখানি লাগলে কৌ হবে ?’

ফুল্লরা বলেছিল, ‘একটুও না। শীগুগির ঘরে চলো।’

‘তুমি তো রাগ করেছো।’ কমল বলেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, ‘হ্যাঁ করেছি। এখন ঘরে চলো।’

‘না, তুমি রাগ করলে ঘরে যাবো দে মন করে ?’ কমল বলেছিল।

ফুল্লরা কমলের চুলের ঝুঁটি মুঠি করে ধরেছিল, টানতে টানতে বলেছিল, ‘এমনি করে ?’

‘উহু লাগছে, ফুল্লরার সঙ্গে চলতে চলতে কমল বলেছিল।

ফুল্লরা না খেমে, কমলের চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলেছিল, ‘লাগুক।’ একেবারে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে ফুল্লরা কমলের চুলের মুঠি ছেড়েছিল। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করেছিল। তারপরেই কমলের দিকে ফিরে হাত তুলে মারতে উত্তৃত হয়েছিল।

কমল চকিতে ফুল্লরার হাতটা ধরে ফেলে বলেছিল, ‘আরে, আর মেরো না। এখনো চুলে ব্যথা করছে ?’

‘করুক, তবু মারবো।’ ফুল্লরা হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বলেছিল।

কমল ফুল্লরার হাত ছেড়ে দিয়ে আস্তসমর্পণ করে বলেছিল, ‘মারবো তবে।’

‘মারবোই তো।’ ফুল্লরা কমলের ঘাড় চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেছিল, ‘কেন কেন কেন?’

কমল পাগলের মতে হেসে বলেছিল, ‘একে মাব বলে নাকি?’

ফুল্লরা কমলের ঘাড় থেকে হাত তুলে, ওর গালে আস্তে একটা চড় কথিয়ে দিয়েছিল, ‘হয়েছে তো?’

‘এইটুকু?’ কমল বলেছিল, এবং আর একটি গাল পেতে দিয়েছিল।

ফুল্লরা মাববার জন্য হাত তুলেছিল, কিন্তু হঠাৎ সেই হাত দিয়ে কমলকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠেছিল, ‘তুমি ভারি পাজী।’ ওব ষেদাক্ত বোতাম খোলা বুকে কমলের মুখটা চেপে ধরেছিল।

দরজাব বাইরে খট খট শব্দ শোনা গিয়েছিল, আর বেলুদির স্বর, ‘দরজা খোল্ৰে, বাইরে আৱ দাঢ়াতে পাৱছি না।’

ফুল্লরা ছিটকে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল।...

সেই থেকে আট মাস, কমলের সঙ্গে জৈবনটা প্রতিদিনের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু বিমানের সঙ্গে মেলামেশার পুনরাবৃত্তি না। কমলের কোনো ছদ্মবেশ ছিল না। কেবল কিছু আদায় করে নেবার দাবী ছিল না কমলের। কমল কি ওৱ প্ৰেমিক ছিল? প্ৰেমিকের সংজ্ঞা কী? ফুল্লরা জানে না। কমল ছিল প্ৰিয়তম সৰ্বা, ঘনিষ্ঠতম বন্ধু।

। পনেরো ॥

‘আমরা ছটো স্টেট পার হয়ে এসেছি ।’ কমলের সেই অঙ্গুত নিচু
স্বে ফুলবা চমকিয়ে উঠলো । কমল আবাব বললো, ‘আমরা শুয়েস্ট
বেঙ্গল আৱ বিহাব ক্ৰস কৰে উড়িষ্যায় পড়েছি । তুমি সুবৰ্ণৱেখাৰ ব্ৰিজ
দেখলো না । বাবিপদা ছাড়িয়ে আমবা এখন বালেশ্বৰেৱ পথে ।’

ফুলৱা যেন স্বপ্নেৱ ঘোৱ থেকে জেগে উঠে বললো, ‘আশৰ্য, কিছু
খেয়াল কৱিনি তো ।’

‘সেটাই লক্ষ্য কৰছিলাম ।’ কমলেৱ কালো ঠুলিতে কৌতুকেৰ
ঝিলিক, ‘হু’ একবাৱ চেষ্টা কৱে দেখেছি, তোমাৰ ধ্যান ভাঙতে
পাৰিনি ।’

‘ধ্যান ?’

‘নয় ? তোমাকে তোমাৰ দিদিৰ ছেলেও হু’ একবাৱ ডেকেছিল ।

ফুলৱা বুবাইয়েৱ দিকে তাকালো । বুবাই এখন জানালা দিয়ে
বাইৱে তাকিয়ে দেখছে । দিদিৰ । ফুলৱা মুখ ফেৱাতেই কুমাৰদাৰ
সঙ্গে ওৱা চোখাচোখি হলো । কুমাৰদাৰ ঠোটেৱ কোনে কি হাসি ?
ও ডান দিকে একটু ঝুঁকে কুমাৰকে জিজেস কৱলো, ‘স্টপেজগুলোতে
নামেননি ?’

কুমাৰ বললো, ‘না । বালেশ্বৰে নেমে থাবো । তোমাৰ নামবাৰ
ইচ্ছে ছিলুকি ?’

ওদেৱ কথা শুনে অনু ফিৱে তাকালো, মুখে জিজাসু হাসি । কুমাৰ-
দাৰ কথায় ঠাট্টাৰ বক্রতা । ফুলৱা বললো, ‘না, আমাৰ নামবাৰ দৱকাৰ

ছিল না।’ ফিরে তাকালো কমলের দিকে, ‘তোমার জন্মই এরকম
হলো।’

‘কী রকম?’ কমলের স্বরে বিশ্বায়।

ফুল্লরা বললো, ‘কী সব বাজে বাজে কথা বলছিলে, আর সে-সব
মনে পড়ছিল।’

কমলের কালো টুলিতে হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠলো। হাসি ওর
গোফ দাঢ়ির ভাঙ্গেও। বললো, ‘সেই স্বেদাক্ষ রমণীর—।’

‘চুপ করো।’ ফুল্লরা ঠোটে চোখে কৌতুকের ঝিলিক দিয়েই যেন
প্রায় নিচু স্বরে ধমকিয়ে উঠলো।

‘তুমি সবটাই ভুল বলেছো। আমার মনে হয়, তুমি কামু-র “দ্য
সাইলেন্ট ম্যান” থেকে কিছু বলতে চেয়েছিলে, তাই না।’

কমলের টুলির বাইরে, কপালের বাঁ দিকে মোটা ভুক খোঁচা হয়ে
উঠলো। হঠাৎ কিছু বললো না। কয়েক মুহূর্ত পরেই হেসে বললো,
‘আশ্চর্য, ঠিক বলেছো তো।’

‘কিন্তু সোয়েট গুম্যানের কথা কোথাও লেখা আছে বলে আমার
মনে পড়ছে না।’ ফুল্লরা বললো, ‘ওটা বোধহয় তোমার মনগড়া।’

কমল সহজেই মেনে নিল, ‘তা হতে পারে। কোন্ জায়গাটাৰ
কথা বলতি, তুমি বুঝতে পারছো?’

‘বোধহয়।’ ফুল্লরা বললো, ‘যেখানে অতীতের স্বপ্ন, “গভীর স্বচ্ছ
জল, উজ্জল উষ্ণ রোদ, সুন্দরী ঘূর্ণনী মেয়ে, সতত কর্মচার্পল্য, এ ছাড়া
সুব্রত বলতে কিছু আর ডিল না দেশে।”...কিন্তু এ তো সেই ডস্টয়েভস্কিৰ
প্রতিক্রিয়ানি, যৌবন চ'লনাশেই শেষ, তাৱপৰে যারা বেঁচে থাকতে চায়,
তাৱা মূর্খ আৰ অপদার্থ। তুমি কি হতাশায় ভুগছো?’

‘কেন বলো তো?’

‘এসব কথা তোমার মনে আসছে কেন?’

‘কাৰণ আমাদেৱ সমস্ত জীৱনটাই অস্বাভাবিক টুকু।

‘আদো নয়। কামু নিশ্চয়ই জানতেন, কিন্তু ডস্টয়েভস্কি জানতেন

না, আধুনিক বিজ্ঞান, মানুষকে দীর্ঘজীবী করবে, অতএব তাদের যৌবনও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

কমলের কালো টুলিতে আর দাঢ়ি গোফের ভাঁজে হাসির ঝিলিক ফুটলো, বললো, ‘আধুনিককালের সঙ্গে এখানেই আমার গোলমাল লেগে যাচ্ছে। তোমাদের এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজি, সবই আমার কাছে কানাগলি ছাড়া কিছু নয়।’

ফুলরা ঘাড় কাত করে, ওর স্বচ্ছ রঙীন কাঁচের ভিতরে চোখ জোড়া নিবিড় করে, প্রায় ফিসফিস করে বললো, ‘তোমার কথায় যেন রিএকশনারিয়ে সুর শুনতে পাচ্ছি।’

‘কারণ রিএকশনারিদেব সম্পর্কে তোমার কোনো বাস্তব ধারণা নেই।’ কমল বললো, ‘সেইজন্যট ওরকম শুনতে পাচ্ছে। ধনতন্ত্রই বলো, আর সমাজতন্ত্রই বলো, সবখানে জেরটোক্রাসির দৌরান্ত্যে তো আর টেকা যাচ্ছে না।’

‘জেরটোক্রাসি মানে? বৃদ্ধতন্ত্র?’

‘হ্যাঁ।’

‘তুমি আজকাল নতুন করে ভাবছো দেখছি। কিন্তু সমাজতন্ত্রেও জেরটোক্রাসির দৌরান্ত্য?’

‘আমি তো তাই দেখছি, সব সমাজেই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব। আর আমাদের দেশের অবস্থা দাঢ়িয়েছে, ছুঁচোর গোলাম চামচিকে, তার মাইনে চৌদ্দিসিকে। গোলামের গোলাম। সমাজ-চেতনার চেহারাটা কতো তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে, সেটা আমরা ধরতেই পারছি না। এই বিজ্ঞান আর টেকনোলজির দাসত্ব ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে।’ কথাগুলো বলতে বলতে হঠাৎ যেন কমল সচকিত হয়ে ওর আশেপাশে তাকিয়ে দেখলো। কিন্তু ওর মুখে এখন আর সেই কৌতুকের হাসি নেই। অথচ ও না থেমে আবার বললো, ‘যে-কোনো অস্বাভাবিকতাই আজ আমাদের পথের অন্তরায়। সেইজন্যই কামু বা ডস্টয়েডেক আমার মোটেই অতীত স্বপ্নবিলাসী মনে হয় না।’

ফুল্লরা মনে মনে ভীষণ অবাক হচ্ছিল। মাথা ঝুঁকিয়ে নিচু স্বরে
জিজ্ঞেস করলো, ‘তুমি কি মত বদলেছো?’

‘কথনোই না।’

‘পথ?’

‘একটা নির্দিষ্ট মত থাকলে, পথ সব সময়েই বদলাতে পারে। কিন্তু
বৈপ্লাবিক শর্ততারও একটা সৌমা আছে।’

কমলের কথা শেষ হবার আগেই, ফুল্লরা ওর ইঁটুর ওপরে আঙুল
দিয়ে খোঁচা দিল, ‘আস্তে, অনেক কথা বলে ফেলছো।’

ঠিক এ সময়েই বাসের গতি কমে এলো, আর কগুলিমের গলা
শোনা গেল, ‘বালেঘর। পৌনে এক ঘণ্টা স্টপেজ।’

বাসের ভিতরে নানা স্বরে নানা কথা শোনা গেল। যাত্রীরা
সকলেই যেন কগুলিমের এই ঘোষণাটির অপেক্ষা করছিল। কুমার বাঁ
দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, ‘ফুলু, এবার বাড়ালী মতে লাঞ্ছটা সেরে নিতে
হবে।’

বাস দাঢ়াবার সঙ্গে সঙ্গেই, যাত্রীরা অনেকে উঠে দাঢ়ালো।
তাদের নামবার ব্যক্তির সঙ্গেই, বাইরে নানান স্বরে চিৎকার ভেসে
এলো, ‘গরম ভাত ডাল ভাজা তরকারি মুড়িষ্ট মাছের খোল।’
কমা মাংস ঝুটি ভাত তরকারির চিৎকারও শোনা গেল।

‘খুব খিদে পেয়েছে।’ কমল বললো, ‘পেট ভরে ভাত খেতে
হবে।’

ফুল্লরার হাসি পেল, কিন্তু মনের কোথায় একটা কষ্টও বিঁধে গেল।
সকাল বেলা কমলের কাঁচা পাউরঞ্জি খাওয়ার ছবিটা ভেসে উঠলো
চোখের সামনে। বললো, ‘মনে হচ্ছে, অনেকদিন খাওনি।’

কমল হাসলো, ‘খেয়েছি। অনেকটা তাড়া খাওয়া জানোয়ারের
মতো বলতে পারো। যখন সময় সুযোগ পাওয়া গেছে। অবিশ্বাস
সময় সুযোগের সঙ্গে খাবারটাও।’ এ কথাগুলো নিচু গলায় বুলুলো।

‘ফুলু, আয়।’ অনুর ডাক শেঁনা গেল।

ফুল্লরা ফিরে তাকাবার আগেই আবার সেই গান শোনা গেল, ‘হায় এই কি দেখি, এই কি দেখি, আলো আদরি/প্যাট যান্ ওর উচা দেখি, তুধ জোড়া ভারি।’...

‘ফের স্বকুমার। ধমক শোনা গেল পিছনে, ‘নো মোর ডেসক্রিপসান অফ আদরি। এখন পেটেয় ছুঁচোয় ডন মারছে। চল নাম তাড়াতাড়ি।’

ফুল্লরা পিছন ফিরে তাকালো। তিন জোড়া লাল করমচা চোখ। যেন ধন্তাধন্তি করে বাস থেকে নেমে গেল। তার মধ্যেই বোধহয় স্বকুমারের গলা শোনা গেল, ‘তের চৌদ্দির বাপারটাতো তোরা—।’

‘চুপ্পি! স্পষ্টতই স্বকুমারের মুখে হাত চাপা পড়ল।

কুমার বললো, ‘ফুলু, সবাই নেমে গেছে, চলো তাড়াতাড়ি। ভালো হোটেলে আর জায়গা পাবো না।’

ফুল্লরা ব্যস্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আশেপাশে দেখলো। বাসের মধ্যে হৃ একজন ছাড়া যাত্রী নেই। এই অবসরেই ফুল্লরা বলে উঠলো, ‘দিদি শোনো, এই যে কুমারদা, এ আমার বক্স। একসঙ্গে পড়েছি।’ কমলকে দেখিয়ে বললো, আর কমলকে বললো ‘আমার দিদি আর ভগ্নিপতি। ওর নাম বুবাই।’

বুবাইয়ের অভিমান এতক্ষণে কাটলো। কমলের দিকে তাকিয়ে পোকা খাওয়া দ্বাত দেখিয়ে হাসলো। কমল আর দিদি ও কুমারের সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করলো। কুমার তাড়া দিল, ‘চলো নামি!?’

কুমারের পিছনে পিছনেই সবাই নামলো। হোটেলগুলো থেকে এখনো ডাকাডাকি চলছে। ফুল্লরা লক্ষ্য করলো কমলকে। চোখের কালো ঠুলি না থলমেও, ও যে চারদিকে সাবধানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আশেপাশের চেহারা ও লোকজনকে দেখে নিচ্ছে, তা বোঝা যায়। কমলকে লক্ষ্য করতে করতেও, ফুল্লরা কুমার আর অমুর সঙ্গে যেতে যেতে ধমকিরে দাঢ়িয়ে পড়লো। ক্রারণ কমল এক জায়গাতেই দাঢ়িয়েছিল। ফুল্লরাকে দাঢ়িয়ে পড়তে দেখে, কমল ওদের দিকে এগিয়ে এলো, বললো,

‘তোমরা কোথাও থেতে বসে যাও, আমি একটু ঘুরে-ফিরে, অন্ত কোনো হোটেলে বসে থেয়ে নিছি।’

‘কেন, তুমি তো আমাদের সঙ্গেই থেয়ে নিতে পারো?’ ফুল্লরার মুখ থেকে উৎসুক ব্যাকুলতায় কথাটা বেবিয়ে এলেও তৎক্ষণাত ও কুমারের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে ফিরে তাকালো।

কুমার বললো, ‘হ্যা, অমুবিধের কী আছে?’

‘একটু আছে।’ কমল হেসে বললো, ‘আকারণ একটা অস্থিকর অবস্থা সৃষ্টি করাৰ কোনো মানে হয় না। মানে, আমাৰ দিক থেকেই বলছি।’

কমলেৰ শেষেৰ কথাটা যে নিতান্তই সাম্ভূতি দেবাৰ জন্য, ফুল্লরার বুৰাতে অস্মুবিধে হলো না। আসলে অস্থিটা ওৱ না, ফুল্লরাদেৰ। ফুল্লরা ওৱ ব্যাগটা কাঁধেৰ কাছে টেনে তুলে, কুমারেৰ দিকে তাকিয়ে বললো, ‘তা হলে আমি আৱ ও একসঙ্গে অন্ত কোথাও বসে থেয়ে নিছি। তোমরা একটা হোটেলে থেয়ে নাও।’

কুমার তাকালো অমুৰ দিকে। অমু কিছু বলবাৰ আগেই, কমল বললো, ‘কী দৱকাৰ ? তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি ঠিক থেয়ে নেবো।’

‘তা জানি।’ ফুল্লরা হাসলো, ‘একলা একলা খাবে কেন? দেখা যখন হয়েই গেল, চলো দুজনে একসঙ্গে থাই। অবিশ্ব তোমাৰ যদি সত্যি সেৱকম কোনো অস্মুবিধে না থাকে।’

কমল মুখ ফিরিয়ে, চোখেৰ কালো ঠুলি থেকে বোধহয় একবাৰ কুমার আৱ অমুৰ দিকে দেখলো, হাসলো, বললো, ‘অস্মুবিধে আমাৰ কিছু নেই।’

অমু কুমারেৰ দিকে তাকিয়ে বললো, ‘যাক না।’

‘আমি কি আপত্তি কৰেছি নাকি?’ কুমার যেন খানিকটা অস্থিতে হেসে উঠলো।

ফুল্লরা জানে, কুমারদাৰ কাছে ব্যাপারটা মোটেই স্বত্ত্বাদায়ক না। ও কুমারকে কিছুটা চেনে। দিদি অবিশ্ব কিছু না ভেবে, ওৱ মতো

করেই কথাটা বলেছে। কিন্তু ফুলরা নিজেকেই বোধহয় সব থেকে কম জানে। সকালের কলকাতার ফুলরা এখন আর নেই। একটি মেঝের মধ্যে কতো ক্রতৃপক্ষ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে, ও তারই একটা অস্তিত্বাহৱরণ। ও নিজেও জানে না, এখন কমলকে নিয়ে ও কতো ব্যুৎপত্তি, উৎসুক, ব্যাকুল, এবং নিজের দিদি ভগ্নিপতি আর তাদের ছেলের কাছ থেকে কতোটা সরে গিয়েছে। ওর ছুটি আর বেড়ানোর সমস্ত খুশি আর উদ্দেশ্যনা এখন একটি মাত্র মামুষে কেন্দ্রীভূত। এখন জানালার ধারে বসার খুনসুটি করার মন নেই। ও খুব অনায়াসেই কমলের সঙ্গে পা বাড়িয়ে, সকলের দিকে হাত তুলে বললো, ‘তা হলে তোমরা একজায়গায় বসে পড়, আমিও থেয়ে আসছি।’

বুবাই ঠিক তখনই, ওর টেঁট ফুলিয়ে, ফুলরাকে কড়ে আঙুল দেখালো। অর্থাৎ আবার আড়ি।

॥ ঘোল ॥

কমল একটা সিগারেট ধরালো। ও যে পরিত্বপ্তি করে খেয়েছে, ফুল্লরা তা দেখেই বুঝতে পেরেছে। বাস স্টপের ঘিঞ্জি পরিবেশটা ছাড়িয়ে, কমল বেছে নিয়েছিল, বাস-লরি-ট্রাক চালকদের প্রকৃত পান্থ-শালা বলতে যা বোঝায়, সে-রকম একটি খাবার জায়গা। বালেখের মতো জ্বায়ায়, বড় রাস্তার ওপরে নির্জনতা বলতে কোথাও কিছু নেই। তবু লরিচালকদের লম্বা খড়ের চালের ঘর, অনেকগুলো খাটিয়া, আর ঝটি-তরকা-মাংসের গঙ্গে পরিবেশটা অনেক ভালো।

ফুল্লরা প্রথমে একটু অস্তিত্বোধ করলেও, কাটিয়ে উঠেছিল। খাবে কী না, ঠিক করতে পারেনি। কিন্তু ভাতের বদলে, কমলকে ঝটি পেঁয়াজ কাঁচালঙ্কা আর তরকা দিয়ে খেতে দেখে, ওর খিদেও যেন রসনা আপ্সুত করে জেগে উঠেছিল। খাবার পাত্র আর জলের গেলাস দেখে যে-টুকু বিপ্লি লেগেছিল, ধোয়া পঞ্চপাতা আর মাটির ভাড় দেখে সেটাও কেটে গিয়েছিল। কমল ভাত খাবে বলেছিল, কিন্তু পেট ভরে খেয়ে নিল ঝটি।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো, ‘ভাত খাবে না?’

‘না, ঝটিতেই পেট ভরে গেছে।’ কমল বললো, ‘আধ-ডজন ঝটির পরে আর ভাত চলে না। তুমি তো এখনো খাবার নিলেই না।’

ফুল্লরা হেসে, বললো, ‘তোমার খাওয়াটা দেখলাম। এবার আমি খাবো। তবে আমিও ঝটি খাবো।’

‘এরকম তরকা মাংস দিয়ে ভাত খাওয়া যায় না।’ কমল এক মুখ ধ্বংসা হেড়ে বললো, ‘এবার এক গেলাস চা খেতে হবে।’

ফুল্লরা অবাক হেসে বললো, ‘এই গরমে আর হত্তপুরে ?’

‘গরমে, গরমই তো ভালো !’ কমলের চোখে ত্রুটির হাসি। এখন
ওর চোখে সেই মুখোশের মতো ঠুলিটা নেই। বললো, ‘তোমার জন্য
কী খাবার দিতে বলবো ?’

ফুল্লরা বললো, ‘আমি বলছি !’

বড় ঘরটার এলোমেলো খাটিয়ায় বসে আরে। তু’ তিনজন ডাইভার
ক্লিমারু খাচ্ছিল। মুরগী আর বেড়াল পাশাপাশই ঘুরে বেড়াচ্ছে
খাটিয়ার নিচে। ঘবের একপাশে, উচু আব চওড়া উমুনের ধারে
রাঙ্গায় রত একজন মাঝবয়নী লোকের দিকে হাত তুলে ফুল্লরা ডাকলো,
‘এই যে ভাই, এখানে একটা কঢ়ি আব মাংস দিন। কাচা পেঁয়াজ
আর লংকা দেবেন !’

লোকটা মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, ‘আভি লে আতে !’

কমল ঠোট টিপে হেসে বললো, ‘একদিক থেকে, তুমি সঙ্গে থাকায়
ভালোই হলো !’

‘কী রকম ?’ ফুল্লরা জিজ্ঞেস করলো।

কমল বললো, ‘ছদ্মবেশটা ভালোই হলো। একটি ছেলে আর
মেয়ে জোড় বেঁধে ঘুরলে, এক শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই।
কিন্তু আমাকে যারা খুঁজছে, তাদের দৃষ্টি হঠাতে আমাদের ওপর
পড়বে না। বিশেষ করে তোমার মতো একজন শহরে ক্লপসৌ
আধুনিকা—।’

‘একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে !’ ফুল্লরা বাধা দিয়ে বললো।

‘মোটেই নয় !’ কমল বললো, ‘ধরো আমি যদি বাসের সেই
ছেলেগুলোর বন্ধু হতাম, তা হলে তোমাকে দেখে নির্ধার আওয়াজ
দিতাম !’

ফুল্লরা পুরনো দিনের মতোই কমলকে মারবার জন্য হাত তুললো।
কমল তাড়াতাড়ি মাথা সরিয়ে হেসে উঠলো। বললো, ‘সত্যি, ভেবো
না যে এ ক’বছরে চোখের দৃষ্টিও নষ্ট হয়ে গেছে। তুমি দেখতে আগের

থেকে অনেক শুন্দর হয়েছো। অবিশ্বি তুমি বরাবরই তাই ছিলে, তবু যেন—।'

'তোমার মাথা।' ফুলরা বললো, 'আমি এখন বুড়িয়ে যাচ্ছি। জানো না, মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ি? অবিশ্বি তোমারই কথা, পুরুষেরা চলিশে মৃত্যু আর অপদার্থ।'

কমল বললো, 'আমি বলেছি চলিশের পরেও যদি পুরুষের নিজেদের মুবক মনে করতে চায়, তবে ব্যাপারটা তাই দাঢ়ায়, তথাকথিত বিজ্ঞানের কল্যাণে অবিশ্বি এখন বাবারাও ছেলেদের সঙ্গে টকর দিতে চাইছে—চেহারায় পোশাকে বৃত্তিতে উপর্যুক্ত, এই যুগের যা অস্বাভাবিকতার লক্ষণ। খৎসেরই সংকেত এসব। এই সব বিজ্ঞান, টেকনোলজি—।'

ফুলরার সামনে একটি ছেলে ধোয়া পদ্ধতাতা পেতে দিল, আর এক ভাড় জল। সেই মাঝবয়সী লোকটি ঝটি আর মাংস বেড়ে দিল। একপাশে দিল ছুটি কাঁচা লংকা আর একটি আস্ত পেঁয়াজ। ফুলরা বললো, 'তা হলেও মেয়ে হিসেবে আমি বুড়িয়ে গেছি। আমার পঁচিশ হলো।'

কমল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দেখা গেল একটা জৌপ আস্তে আস্তে ঝোপড়ির সামনে এসে দাঢ়ালো। পুলিসের জৌপ। ডাইনে বসে একজন উনিফর্ম পরা ইনস্পেক্টর। ইনস্পেক্টরের কোমরে রিভলভার। চোখে সান গ্লাস। বাঁয়ে উনিফর্ম পরা ড্রাইভার।

ফুলরা খাবারে হাত দিতে গিয়ে, চমকিয়ে কমলের দিকে তাকালো। কমলের চোখে তৌক্ষ দৃষ্টি, কিন্তু ও মুখটা পাশ ফেরালো। সিগারেটটা ফেলে দিল নিচে, বাঁ হাত নামিয়ে নিল পাঞ্চাবির তলায়। প্রায় ফিসফিস করে বললো, 'খাও, খেতে থাকো।'

ফুলরার মনে হলো, অসন্তুষ্ট। তবু ও ঝটিতে হাত দিল। জৌপের ড্রাইভার নেমে এগিয়ে এসে, এদিক ওদিক দেখে হিন্দৌতে জিজ্ঞেস করলো, 'দিবাকর মিষ্টিরি কোথায়?'

মাঝবয়সী সেই লোকটিই জবাব দিল, ‘এদিকে আসেনি।’

ড্রাইভার বললো, ‘গ্যারেজ থেকে বললো, এখানে থেতে এসেছে ?’

মাঝবয়সী লোকটি হেসে বললো, ‘দেখুন গিয়ে, সরাব থেয়ে কোথায় পড়ে আছে ?’

ফুল্লরার মনে হলো, জৌপে বসে ইনস্পেক্টর কমলকেই দেখছে। ও আড়চোখে কমলকে দেখলো। কমলের মুখ শক্ত, ডান হাতে ওর নিজের চোখের ঠুলিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। ড্রাইভার কমল আর ফুল্লরাকে একবাব দেখে, পিছন ফিরে ইনস্পেক্টরের দিকে তাকালো। তারপর নার্কিদের দিকে, যারা খাটিয়ায় বসে, কোলে এনামেলের থালা নিয়ে খাচ্ছিল।

ইনস্পেক্টর নেমে এলো। কালো বেঁটেখাটো শক্ত চেহাবা, দপ্পিত
ভঙ্গিতে ঝোপাড়ুর সামনে এগিয়ে এসে, মাঝবয়সী লোকটির দিকে
তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, ‘দিবাকরকে এখন কোথায় পাওয়া যেতে
পারে ?’

ফুল্লরার বুকে দামামা বাজছিলই। একটা টাউস পুলিস ভ্যান
জৌপের পিছনে এসে দাঢ়াতেই, ওব হাত আপনা থেকেই এমন নড়ে
উঠলো, জলের ভাড়ট। বেঁধির মতো সরু টেবিল থেকে নিচে পড়ে গেল।
সেদিকে ওর খেয়ালই নেই, যে ভাড়ের জল চলকে পড়লো ওর হাঁটু
কাছে শাড়িতে। ও কমলের দিকে তাকালো, মুখ রক্ত শৃঙ্খ।

কমল তাড়াতাড়ি ওর দিকে ফিরে নিচু স্বরে বললো, ‘এত আপসেট
হচ্ছে কেন ? থেতে থাকো না।’ ও নিজেই নিচু হয়ে ফুল্লরার শার্ডুর
জল খেড়ে দিল।

ফুল্লরা কমলের বাঁ দিকে কঢ়ি করে একটা শব্দ শুনতে পেল। কমল
মুখ তুলে স্বাভাবিক ভাবে হাসলো। অন্তত চেষ্টা করলো।

মাঝবয়সী লোকটি রাস্তার ধারে এগিয়ে গিয়ে ইনস্পেক্টরকে বললো,
‘দিবাকরের কোনো ঠিক নেই সার। একবাব সরাব থেলে, ও কোথায়
ধায়, কোথায় থাকে, কেউ বলতে পারে না।’

ভ্যানের ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে, ইনস্পেক্টরের উদ্দেশ্যে বললো,
‘দিবাকরের দেখা পেলেন স্থার ?’

ইনস্পেক্টর পিছন ফিরে বিরক্ত স্বরে জবাব দিল, ‘না।’

জৌপের ড্রাইভার বলে উঠলো, ‘সব ভালো মোটর মিস্ত্রিগুলোই
মাতাল।’

ভ্যানের ড্রাইভার বললো, ‘জীপটা কি একেবারেই চলছে না ?’

জৌপের ড্রাইভার জবাব দিল, ‘চলছে। তবে মনে হচ্ছে, এ. সি.
পাস্পে কোনো গোলমাল হচ্ছে, গাড়ি টানছে না। তার মানে তেল
আসছে না, আর বারে বারে ব্যাক ফায়ার আওয়াজ দিচ্ছে।’

ইনস্পেক্টর ঝোপড়ির ভিতরে সকলের মুখের দিকেই চোখ বুলিয়ে
দেখলো। কমল আর ফুল্লরাকেও দেখলো। মাঝবয়সী লোকটিকে
জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমার এখানে যারা রয়েছে, তাদের কেউ মেকানিক
আছে ? একবার দেখতে পারবে ?’

মাঝবয়সী লোকটি কমল আর ফুল্লরা ছাড়া বাকী কয়েকজনকে
দেখে নিয়ে বললো, ‘এরা সব ভিন্নদেশী ড্রাইভার আছে। খাওয়া হলেই
গাড়ি নিয়ে চলে যাবে।’

ভ্যানের ড্রাইভার ইনস্পেক্টরকে বললো, ‘সামনের পেট্রোল পাস্পে
আশুন স্থার, আমি দেখছি।’

ভ্যানটা তার এঞ্জিনের স্টার্ট থামায়নি। দু’ এক মিটার ব্যাক করে
সোজা সামনে এগিয়ে গেল। ইনস্পেক্টর বেশ রোখা স্বরে মাঝবয়সী
লোকটিকে বললো, ‘দিবাকর তোমার এখানে এলেই থানায় যেতে
বলবে।’

‘বলবো স্থার !’ লোকটি জবাব দিল।

ইনস্পেক্টর এবার যেন স্পষ্টতই তার সান প্লাসের ভিতর থেকে
ফুল্লরাকে লক্ষ্য করে, পিছন ফিরে চলে গেল। উঠলো গিয়ে জৌপে।
ড্রাইভার ঘূরে বাঁ দিকে উঠে, এঞ্জিন স্টার্ট করলো। জীপটায়েন
খরগোসের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েক মিটার গিয়ে, একটা ব্যাক

ফাগ্যারের শব্দ করলো, তারপর আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে গেল।

‘এবার দয়া করে খাও।’ কমল বললো, ‘তুমি প্রায় একটা সিন ক্রিয়েট করে ফেলেছিলে।’

বোপড়ির অগ্নাশ্চ লোকগুলো তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পুলিসের আচরণের বিকল্পেই খানিকটা হাসি ঠাট্টা মেশানো কথাবার্তা। ফুল্লরা কঢ়ি ছিঁড়ে মুখে দিতে গিয়ে বললো, ‘ভীষণ ভয় পেরে গেছলাম।’

‘ভয় পেয়ে লাভ কী?’ কমল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আব দেশলাই বের করে বললো, ‘বিপদ তো যখন তখনই আসতে পাবে। তবে এ ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালৌয়, আসলে ওরা মিস্টিরিকে খুঁজতেই এসেছিল।’

ফুল্লরা অগ্নাশ্চদের একবার দেখে, মুখের খাবার গিলে বললো, ‘তুমি ভয় পাওনি?’

‘না। তবে আমি যে-কোনো পরিস্থিতিব মোকাবিলা করতেই প্রস্তুত আছি।’ কমল ঠোঁটে সিগারেট চেপে ধৰে বললো, ‘ভয় পেলে আর প্রস্তুত হওয়া যায় না। তবে আমার একটাই ভরসা। ওয়েস্টবেঙ্গল আর বিহার পেরিয়ে এসেছি। বিপদের সন্তাননা ওদিকেই বেশি ছিল।’ ও দেশলাইয়ের কাঠি জালিয়ে সিগারেট ধরালো।

ফুল্লরার মুখে আস্তে আস্তে ওর স্বাভাবিক রঙ ফিরে এলো। মুখের ভিতর কঢ়ি আর মাংসের স্বাদটাও বেশ উপভোগ করছে। নিচু স্বরে বললো, ‘তোমার পাঞ্জাবি ঢাকা ট্রাউজারের বাঁ দিকের পকেটে কিছু আছে না?’

‘ও-সব কথা জিজেস করতে নেই।’ কমল এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ঈষৎ হেসে বললো, ‘অমুমান যখন করতে পেরেছো, তখন ঠিকই আছে।’

ফুল্লরা বললো, ‘তুমি আমার ইঁটুর কাছে জল মুছিয়ে দেবার সময় একটা কঢ়ি করে শব্দ হয়েছিল।’

‘তা হয়েছিল। খুটা লক্ষ করা ছিল, জল মোছার ফাঁকে আনলক্ষ করে নিয়েছিলাম।’ কমল বললো, আশেপাশে একবার তাকিয়ে দেখলো, ‘যদি ইঠাং দরকারে লেগে যায়।’

ফুল্লবাৰ চোখে একটা উদ্বিগ্ন অবাক অনুসন্ধিংসা, ‘যদি কোথাও কিছু ঘটেই যায়, একলা একটা অস্ত্র দিয়ে, অনেকেৰ সঙ্গে তুমি পেৱে উঠবে কেমন কৰে?’

‘এৱকম ক্ষেত্ৰে ডিফেন্স আৰ স্কেপটাই আসল কথা।’ কমল বললো, ‘আমি তো আৱ লড়াই কৱতে বেঠোৰ্হানি। আসলে আমি তো আবাৰ গুয়েস্টবেঙ্গলেই ফিৱৰো।’

ফুল্লবাৰ অবাক হয়ে জিজেস কৱলো, ‘তাৰ জন্ম পুৱৈ ঘূৰে?’

‘হ্যাঁ। কলকাতা থেকে গুয়েস্টবেঙ্গলেৰ কোনো গ্ৰামে যেতে হলে সোজাপুজি যাবাৰ বাস্তা আমাৰ নেই।’ কমল হাসলো, ‘তুমি আৰ একটা কটি থাও।’

মাৰবয়সী, লোকটা একটা মস্ত বড় কাঁচৰ গেলাসেৰ গলা ভৱতি ধূমায়িত দুধেল চা কমলেৰ সামনে বাখলো।

ফুল্লৱা বললো, ‘বক্ষে কৰো, একটা কটিতেই আমাৰ পেট ভবে গেছে।’

মাৰবয়সী লোকটা বোধহয় ফুল্লৱাৰ বাঙলা কথা বুৰতে পাৱলো, হিল্দৌতে বললো, ‘তো গবম। ভাত নিন না দিদিমণি। মাছেৰ ৰোল আছে।

ফুল্লৱা মাথা নেড়ে বললো, ‘না না, আমি আৰ কিছু খাবো না।’

মাৰবয়সী লোকটা সবে যেতে, কমল বললো, ‘ভয়েই তোমাৰ পেট ভৱে গেছে। দিদু জামাইবাৰুৰ কাছে থাকলে, পেট ভবে খেতে পাৱতে।’

‘ভুল।’ ফুল্লৱা জোৱ দিয়ে বললো, ‘দিদিদেৱ সঙ্গে খেতে বসে, পুলিসেৱ ওই জীপ আৱ ভ্যান দেখলো, আমি খেতেই পাৱতাম না। কেবলই মনে হতো, তোমাৰ একটা কিছু বিপদ ঘটতে চলেছে।’

কমল ওর সেই ঝকঝকে চোখ তুলে ফুল্লরার মুখের দিকে
তাকালো। ওর বাঁ ভূজ একটু কুঁচকে উঠেছে, চোখে জিজাসা। ফুল্লরার
মুখে ছ'টা লাগলো, বললো, ‘জানি, তুমি কৌ ভাবছো। ভাবছো,
এতকাল দেখাসাক্ষাৎ নেই, তুমি মরে গেছ কৌ বেঁচে আছো, তার জন্য
কিছু যায় আসেনি, আর হঠাত আজ পথে দেখা হয়ে যেতেই এতোটা
ঝ্যাঙ্জাইটি—বেশ একটু বাড়াবাড়ি লাগছে, তাই না?’

কমল হঠাত কোনো জবাব দিতে পারলো না, ঠোঁটে একটু হাসি
ফুটে উঠলো। ফুল্লরা যেন কেমন উদ্দেশ্যিত হয়ে উঠলো, ‘জানি জানি,
বুঝিও। অবিশ্য এরকম ভাবাই স্বাভাবিক, আর সত্যিই, আমি তো
আমার জীবন থেকে তোমাকে একরকম বাদ দিয়েই রেখেছিলাম।
তুমি এমনভাবেই সরে গেছলে—যেন আমি বা আমরা অনেকেই
তোমার জীবনে আদৌ কোনোকালে ছিলামই না।’

‘শেষ গো অস্বীকার করছ না—।’ কমল শাস্ত্রভাবে কথাটা
বলতে গেল।

ফুল্লরা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, ‘না না, ভেবো না, তার
জন্য তোমাকে কোনো দোষ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি একটা কথা হয়তো
বুঝবে না কমল—।’

‘সস্ম—।’ কমল শব্দ করে উঠলো।

ফুল্লরাও মুহূর্তেই ঠোঁট টিপলো। কিন্তু ওর মুখে রক্তের ছটা, চোখ
ছলছলিয়ে উঠেছে। বললো, ‘সরি খেয়াল ছিল না। কিন্তু আমি
হয়তো তোমাকে বোঝাতে পারবো না,—আমি একটা সামাজিক
মেয়ে, কয়েক বছর পরে তোমাকে আচমকা পেয়ে—মানে দেখা পেয়ে,
আমি যেন সব তুলে গেছি।’

ফুল্লরার কথার মাঝখানেই, কমলের একটা হাত ফুল্লরার টেবিলে
রাখা বাঁ হাতের ওপর এসে পড়লো, একটু চাপ দিল, বললো, ‘ফুল্লরা
তোমার মনের কথা হয়তো খানিকটা বুঝতে পারছি। তোমার দেখা
পেয়ে, আমার মনেও কৌ কিছু হয়নি ভেবেছো? আমি তো অমাঞ্চল

হয়ে যাইনি, বরং মানুষ হিসাবে পারফেকশনের কথাই সব সময় মনে হয়, যদিও জানি না, বুঝে উঠতে পারি না, হোয়াট ইজ ডি ডেফিনেশন অফ এ পারফেক্ট ম্যান !’

ফুল্লুরা তাকালো কমলের চোখের দিকে। শুরু চোখের হাসিতে বিষণ্ণতার গ্লানতা। কিন্তু ফুল্লুরা চোখের কোণে দড়ি বড় ফেঁটায় জল জমে উঠেছে। গালে বেঞ্চে পড়ার মুহূর্তেই ‘যেন টের পেল, আর ঢাঢ়াতার্ডি আঁচল তুলে, চোখের দুই কোণ চেপে চেপে মুছে ন্তে। অশ্রু স্বরে বললো, ‘সরি !’

‘এভাবে সরি বলো না !’ কমল বললো, ‘ও সব সরি-টবি শুনতে আমার ভাঙ্গে লাগে না। দেবো না, আমি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি, যাদের বুক টাটায় না, চোখে জল আসে না, মন বলে কোনো পদ্ধার্থ নেই। আমার ধারণায় আজ পয়ন্ত পৃথিবীতে যতো বৃক্ষ যুক্তি দিয়ে কাজ হয়েছে, তাব অনেকখানিই পণ্ড হয়েচে হৃদয়হীনতার জন্য। আমাব কষ্ট হলে, আমি সরি-টবি বলতে পারি না !’

ফুল্লুরা দুই চোখে যেন অপরিসাম বিশ্বায় ও মুক্তি, প্রায় ফিসফিস করে বললো, ‘আমি যেন তোমাকে ঠিক বুঝতে পারছি না !’

‘আর সেইজন্যই তখন বাসে জিজ্ঞেস করছিলে, আমি মত বদলেচি কৈ না !’ কমল হাসলো, ‘তোমার মনের একটা ছকে আমি বাঁধা পড়ে আছি। দোষ দেবো না তোমাকে, কিন্তু সত্যি বলছি ছকটা বড় খারাপ ব্যাপার। ছক থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া উপায় নেই। যে-নজেকে মুক্তি ভাবতে পারে না, সে অন্যদের মুক্তি করবে কী করে ? কোনো কিছুতেই ছকের থেকে খারাপ কিছু নেই, তা যদি বিপ্লবও হয়। আর বিপ্লবই বা কী ? তাৰ কোনো শেষ নেই, অতএব কোনো ছকও নেই। আমাদের সঙ্গে যদি তুমি মিশতে, দেখতে আমরা রেভ্যুশনারি থেকে রিবেলিয়ানই বেশি। বিদ্রোহ যুগে—মানে, বিপ্লব। কোনো ইজমেই বোধহয় এৱ কোনো পরিসমাপ্তি নেই। একমাত্র জেরটোক্রাসিই নিজেদের ক্ষমতায় তৃপ্ত

থাকতে চায়। বিপ্লবীদের মধ্যেও বৃক্ষতাঞ্চিকের তো অভাব নেই। আমাদের দেশে তো নেই-ই। ফলে, আমাদের দলের অধিকাংশ শহরের ছেলেরাই অনেকটা ড্রিফ্টারের মতো। তাদের গতি আছে, অথচ যেন সঠিক গন্তব্য নেই, কারোর প্রভুত্ব মানতে পারে না, বর্তমান সমাজের নীতি মানের কোণে মূল্য তো আদৌ নেই তাদের কাছে। হয়তো এটা বিশেষ করে আমাদের বেলায় এমন করে ঘটিতো না, যদি না আমাদের একটা বিরাট অংশের মার্কিসিজম থেকে বিচ্ছেদ ঘটিতো। সব তাঞ্চিকেরা মিলে মার্কিসিজমকে এমন একটা তরল পদাৰ্থের মতো করে তুলেছে, যার কোনো লাজা মাধা নেই। এখন পৃথিবী জুড়ে মার্কিসীয় তত্ত্বেরহ সংকটের কাল ৮লেছে, ফলে আমরা এলোমেলো ছুটে মরিবি। অথচ আমাদের কাছে দাবী কৱা হচ্ছে জিজ্ঞাসাহীন ত্যাগ আৱ উৎসর্গ আৱ খতম—’

‘ফুলুঁ’ রাস্তার ওপৰ থেকে কুমারের ডাক ভেসে এলো।

ফুলুঁ আৱ কমল, দুজনেই মুখ তুলে দেখলো, কুমার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, তাৰ চোখে মুখে ব্যস্ততা ও উদ্বেগ। সে আবাৰ বললো, ‘বাস ছেড়ে দিচ্ছে। আমি তো তোমাদেৱ খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। তাড়াতাড়ি এসো।’

কমল তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে, পাঞ্জাবিৰ পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো, ‘আমাদেৱ কতো হয়েছে তাই?’

ফুলুঁ কমলেৱ কথাৰ তত্ত্ব তথ্য কিছুই সম্যক বুঝে উঠিতে পাৱছিল না, তবু মন্ত্ৰমুক্তেৱ মতো শুনে যাচ্ছিল। কমলকে পকেটে হাত দিয়ে দামেৱ কথা জিজ্ঞেস কৱতেই, ও তাড়াতাড়ি ব্যাগেৱ মুখ খুলে বললো, ‘উহঁ, তুমি নয়, ওটা আমি দেবো। আজ তুমি আমাৱ গেস্ট।’ বলে ব্যাগ থেকে একটি দশ টাকাৰ নোট টেনে বেৱ কৱলো।

কমল হেসে বললো, ‘আপত্তি কৱবো না। আমাৱ থেকে তুমি এখন সলভেন্ট।’

কুমার বললো, ‘তোমরা এসো, আমি বাসটাকে দীড়াতে বলছি।’
বলে সে চলে গেল।

মাববয়সী লোকটি ফুল্লরার হাত থেকে দশ টাকার নোট নিয়ে,
ব্যস্তভাবে খুচরো মিটিয়ে দিল। বোপড়ি থেকে বেরোবার মুহূর্তে,
ফুল্লরা হঠাৎ জিজেস করলো, ‘শ্যামল আর শিবতোষদা এখন কোথায়?’
‘আস্তে!’ কমল নাচু স্বরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠলো, ‘এত সহজে
নামগুলো বলছো কৌ করে?’

ফুল্লরার মুখে বিব্রত অপরাধের হাসি ফুটলো, ‘ওহ সরি।’

‘সরি।’ কমল যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করে হাসলো, বাইরে বেরিয়ে
এলো, ‘চলো, বাসে বসে বলবো। তবে এটুকু জেনে রাখো, শিবতোষদা
এখন জেলে। শ্যামল কলকাতায় আছে, আমার সঙ্গে ওর সম্পর্কে
ফাটল ধরেছে, অবিষ্ণু আমাদের মত আর পথ নিয়েই।’

বাসের ড্রাইভার তখন এঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে, পাগলা ঘোড়ার মতো
হৰ্ন বাজিয়ে চলেছে।

কমল আর ফুল্লরা বাসে উঠতেই, বিরক্ত কণ্টাটির জোরে ঘটি
বাজিয়ে দিল। বাস একটা ঝাকুনি দিয়ে খ্যাপা ঘোড়ার মতোই
চুটলো। আর তখনই সেই গান আবার ভেসে এলো, ‘আবিয়াতো
হেমড়ি তুই আমো আদৰি/পোয়াতি মাগীর।’

‘নো, নো মোর আদিরি ভালগার ফোক্ সঙ্গ।’ কেউ নিশ্চয়
স্বরূপারের মুখে হাত চাপা দিল। অনেকেই পিছনের দিকে তাকালো।
ফুল্লরা একবার কুমারের গন্তাৰ মুখে ম্যাগাজিন পড়া দেখলো। দিদিৰ
সঙ্গে কিঞ্চিৎ হাসি বিনিময়। আর বুবাইয়ের সেই কড়ে আঙুল
দেখানো। বাপ-কা-বেটা। কিন্তু ফুল্লরার স্বতি জুড়ে তখন কয়েক
বছর আগেৰ ঘটনাগুলো ছবিৰ মতো ভেসে যাচ্ছে।

বেলুদি আৱ শিবতোষদাৰ রহস্যময় ছাড়াছাড়িৰ কথা প্ৰথমে ফুল্লরা
বুবতে পাৰেনি। ওকে জানিয়েছিল কমল। শিবতোষদা যথাৰ্থভাৱে
কমিউনিস্ট পার্টিৰ সভ্য না হলেও, বৰাবৰই কমিউনিস্ট মাইগেড
ছিলেন। মাৰ্কসিস্ট তাৰিক হিসাবে, তিনি প্ৰায় একজন নিয়মিত
লেখক ছিলেন। বেলুদিৰ গভীৰ ভগবন্তকিৰিৰ সঙ্গে শিবতোষদাৰ
মাৰ্কসীয় তত্ত্বেৰ যথেষ্ট অভেদ থাকা সত্ত্বেও, তাদেৱ কথনো অসুৰী
দম্পতি মনে হয়নি। নকশাল আলোচনাই প্ৰথম, দু'জনেৰ মধ্যে
চিন্তাগত অভেদটাকে এতোই তুল্পন কৱে তুলেছিল, তাদেৱ একসঙ্গে
বাস কৱাণ আৱ সন্তুষ্ট ছিল না। শিবতোষদা যখন থেকে নকশালদেৱ
সঙ্গে হাত মেলালেন, তখন থেকেই বেলুদিৰ শাস্তিনিকেতনে চাকৰিৰ
আয়োজন। দুজনেৰ ছাড়াছাড়ি পাকাপাকি হতে দেৱি হয়নি।

শিবতোষদাৰ সঙ্গে শ্যামলেৰ থেকে যাওয়াৰ রহস্যও ছিল সেখানেই।
সে ছিল মনেপ্রাণে শিবতোষদাপন্থি, ঘোৱতৰ বিৱোধ ছিল দিদিৰ
সঙ্গে। সেই কাৰণেই ও কলকাতায় শিবতোষদাৰ সঙ্গে থেকে

গিয়েছিল, আর চন্দনাকে নিয়ে বেলুদি চলে গিয়েছিলেন শাস্তি-নিকেতনে। ফুল্লরা এসব জ্ঞেনেছিল কমলের কাছ থেকে, কিন্তু বুঝতে পারেনি, কমলও আস্তে আস্তে শিবতোষদার কাছে রাজনৈতিক দীক্ষা নিচ্ছিল। তবে কমলের মধ্যে একটা পরিবর্তন যে ঘটেছিল, সেটা ওর চোখ এড়ায়নি। ফুল্লরা প্রথমে ধরে নিয়েছিল, কমল ওর কাছ থেকে সরে যেতে চায়। পরে ভেবেছিল, কমলের সঙ্গে বাড়ির কোনো গোলমাল চলছে। তারপরে কমল নিজেই বলেছিল, জীবনকে দেখার চোখ ওর বদলিয়ে গিয়েছে। নিজের জীবনযাপন ওর কাছে অর্থহীন বলে মনে হয়েছিল, স্ব-বিরোধিতায় ভুগছিল, যার থেকে একমাত্র মুক্তির পথ ছিল, সশস্ত্র আন্দোলন সংগঠন করা। ফুল্লরার কাছ থেকে ও খুব সহজেই বিদায় নিয়েছিল, তবু একবার জানতে চেয়েছিল, ফুল্লরা ব্যাপারটাকে কী ভাবে নিচ্ছে ?

ফুল্লরার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল আকস্মিক এবং অতি নাটকীয়, আর একটা আবছা অপরিচয়ের গন্তব্য দিয়ে ঘেরা। উত্তর-বঙ্গে ওদের পরিবারে রাজনীতির কোনো ছোঁয়া ছিল না, তা বলা যায় না। কিন্তু তা ছিল গাকীবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত। ও নিজে কখনো রাজনীতি করার কথা ভাবেনি। ভাবেনি, কমলও কখনো হঠাৎ পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক দলে দৌক্ষা নিতে পারে। ও কমলকে জবাব দিয়েছিল, ‘আমি এ বিষয়ে কিছুই ভাবিনি। তা ছাড়া, তুমি তো তোমার কথা কখনো আমাকে পরিষ্কার করে কিছু বলোনি।’

‘বললে কি তুমি আমাদের দলে আসতে ?’ কমল স্পষ্ট জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা কিছুটা চিন্তিতভাবে মাথা নেড়েছিল, কারণ কমলকে মিথ্যা বলা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না, ‘না, তা বলতে পারি না।’

‘তুমি কি আমার আদর্শে বিশ্বাস কর ?’ কমল জিজ্ঞেস করেছিল।

ফুল্লরা বলেছিল, ‘আমি তোমার আদর্শের মূলটাই জানি না।’

‘আদর্শ সর্বহারার বিপ্লব। আপাতত সশস্ত্র কুবিবিপ্লব, ক্ষমতা দখল। এখন আমার কাছে, ফ্যামিলি, সোসাইটি, সেট, আর সব পলিটিক্যাল পার্টি গুলো মূল্যহীন—সব মিথ্যা। এসবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভব। অর্থহীন প্রয়োজনে বেঁচে থাকার থেকে মরাও ভালো। এখন যে সরকারকে বিপ্লবী সরকার বলা হচ্ছে, এটা একটা সোনার পাথর বাটির মতো।’

ফুলরা বলেছিল, ‘যা আমি বুঝি না, তা নিয়ে তোমাকে কিছু বলতেও পার না। তবে তোমার জন্য আমার ভৌষণ অস্পষ্টি হচ্ছে।’

কমল হেসেছিল, আর সেই হাসির পরেই বিদায়। ও কোথায় গিয়েছিল, এতকাল কৌ করছিল, ফুলরা কিছুই জানে না। কমলের কথা ভাবলেই নানান অশুভ কল্পনা ওর মনে জেগে উঠতো। জেল-খুন-খতম, শহবে বা গ্রামে, ঘাঁর কোমেটাই ও সহজে মেনে নেওয়ার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করতে পারেনি। অশুভ ভাবনার সঙ্গে কোথায় একটা হৃদয়ের সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে। কমলের সর্বত্যাগী দৃঃসাহসের সঙ্গে একটা গৌরববোধও ওর মনে ছিল। আজ অকস্মাত এই সাক্ষাৎ কেবল ওকে চমকেই দেয়নি, মনে হচ্ছে, সেই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তের কমলের সঙ্গে আজকের কমলের কোথায় যেন অমিল দেখা যাচ্ছে। তারি ড্রাইভারদের খোপড়িতে বসে ওর কথাগুলো যেন ঠিক আগের কথার প্রতিধ্বনি না। আর কিছু, আরও কিছু

খোপড়ি থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে বসতে গিয়ে, দেখা গেল, সেই কাফ্কা-এর বইটা তেরো নম্বর আসনে পড়ে আছে। ফুলরা জানালার ধারে বসবার জন্য বইটা হাতে তুলে নিল। কমলের চোখে এখন সেই মুখোশ ধরনের ঠুলি। ফুলরা বইটা দেখিয়ে বললো, ‘তুমি চলে যাবার পরে, তোমাদের তত্ত্ব নিয়ে একটু আধটু পড়াশোনার চেষ্টা করেছিলাম। সেই হিসাবে তোমার কাছে কাফ্কার বই দেখে একটু অবাক লাগছে।’

‘কেন বলো তো?’ কমলের কালো ঠুলিতে জিজ্ঞাসার খিলিক।

ফুল্লরা বললো, ‘মার্কিসিস্টের হাতে কাফ্কা, কোথায় যেন একটা সিনিমিজমের গন্ধ লাগছে।’

‘প্রচলিত অর্থে সৈনিকদের বিশ্বনিন্দুক আর ব্যর্থই বলা হয় বটে।’
কমল বললো, ‘কিন্তু মনে রেখো, সিনিকরাই অথবা সাম্রাজ্যবাদী দার্শনিক।
আর এ গোত্রের জনক ছিলেন এনটিশিনিস নামে এক ব্যক্তি, প্লেটোর
সমসাময়িক। নিরাজ সমাজের ধীরা কল্পনা করেছেন, তাদেরই নৈরাজ্য-
বাদী বলা হয়েছে। অথচ, এখনকার পশ্চিতদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী
একটা গালাগাল। যদিও গালাগালটাৰ অথবা উচ্চারণ করেছিল,
গ্রীসের নগরবাসী শাসকরা, তাদেব অনুচর দার্শনিকেরা। আমার
ধারণা নিরাজ সমাজবাদের উৎস থেকেই বৈজ্ঞানিক মার্কিসবাদের জন্ম,
যার সঙ্গে এমন কি গান্ধীবাদেরও কোথায় মিল আছে।’ বলতে
বলতে হঠাৎ খেমে কমল হেসে উঠলো, ‘সামাজিক কথা থেকে অনেক
কথা বলতে আরম্ভ করেছি। আসলে কৌ জানো, আমার চিষ্টা-ভাবনায়
নানারকম গোলমাল দেখা দিয়েছে। গোলমাল মানে, মূলকে জানা।
তুমি সিনিক শব্দটা যতো সহজে বললে, যতো সহজে অনেকেই
নৈরাজ্যবাদী বলে গালাগাল দেয়, আমি তারই অতিবাদ করতে
চাইছিলাম। কাফ্কা আমার একজন প্রিয় লেখক।’

‘বরাবরই ছিলেন?’ ফুল্লরার চোখে অবাক জিজ্ঞাসা।

কমল বললো, ‘না, কিছুকাল ধরে। আর এই সব কারণেই,
শ্বামগদের সঙ্গে আমার বিরোধ লাগছে। তোমাকে আগেই বলেছি,
বিপ্লবী সরকারে আমার বিশ্বাস নেই, তারা কোনো সোকায়ন্ত্র রাষ্ট্রও
গঠন করতে পারবে না। সেইজন্ত্বই মার্কিসবাদকে আমি আর ঠিক
আগের চোখে দেখছি না। মনে হচ্ছে, যথার্থ না জেনেই, আমি একজন
রাইফেলধারী হয়ে গেছি। মার্কিসবাদের সঙ্গে আমাদের মূলতঃ কোথায়
বিচ্ছেদ ঘটেছে, সেটা খুঁজে বের করা দরকার। এই কথাটা বলেই
আমি দলের একটা ‘অংশের’ শব্দ হয়ে গেছি। ফলে, দলের আর
পুলিসের বন্দুক, তই-ই আমার পিছনে ঘূরছে।’ ও হাসলো।

ফুল্লরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো, ‘দল আৱ পুলিস হুইয়েৱ বন্দুক ?’
‘হুঁ’। কমল একবার আশেপাশে তাকালো, ‘দলে বিবাস-
স্থানকদেৱ স্থান তো নেই-ই। বেচে থাকাৱ অধিকাৰও নেই। আৱ
পুলিস তো বন্দুক উচিয়েই আছে। তোমাকে এসব বলাটা ঠিক হচ্ছে
না অবিশ্বিত।’ ও হাসলো।

ফুল্লরা জিজ্ঞেস কৱলো, ‘কেন ? এটা নিৰ্বেধ ?’

‘একৰকম তো তাই।’ কমল বললো, ‘তা ছাড়া তোমার ভালোই
বালাগবে কেন ?’

ফুল্লরা ব্যগ্র ঘৰে বললো, ‘কিন্তু আমাৱ জানতে ইচ্ছে কৱছে।
শ্বামলেৱ সঙ্গে তোমার বিৱোধ মানে, আমাৱ কাছে মোটেই পৱিষ্ঠাৱ
লাগছে না। শিবতোষদা ? তাঁৰ সঙ্গেও তোমার বিৱোধ ?’

‘নামণ্ডলো। উচ্চাবণ কৱা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।’ কমল বললো,
‘হঁয়া, তাঁৰ সঙ্গেও আমাদেৱ কিছু কিছু বন্ধুৱ মতবিৱোধ হচ্ছে। গত
ছু মাস শহুৱে থেকে মতবিৱোধ অনেক বেড়েছে। গ্ৰাম থেকে এখন
শহুৱেহ খতম অভিযান বেড়েছে। শ্বামলও এখন কলকাতায়। হয়তো
আমাকেও খুঁজছে।’

ফুল্লরা কয়েক মুহূৰ্ত চুপ কৱে রইলো। দলীয় জটিলতা, বিবাদেৱ
কথা ওৱ তেমন জানা ছিল না। ওঁ যেন ঠিক ভাবতে পাৱছিল না,
শ্বামল শিবতোষদাৰ সঙ্গে কমলেৱ কোনো বিৱোধ হতে পাৱে। আৱ
সেই বিৱোধও আগেৱ বিনিময়ে মেটাতে হবে ! ওৱ মুখ দিয়ে হঠাৎ
বেৱিয়ে এলো, ‘তুমি তো তাহলে শাখেৱ কৱাতেৱ তলায় ?’

‘বৱাৰবৱই ছিলাম।’ কমল হাসলো, ‘শহুৱে সশঙ্ক পুলিস, সাদা
পোশাকেৱ গোয়েল্লা, গ্ৰামে সশঙ্ক জোতদাৱ আৱ তাদেৱ পোৰা
গুণা।’

‘কিন্তু পার্টিৰ মধ্যে বিৱোধ ?’

‘এটা একটা অন্ত উপনৰ্গ। মাৱবেই এমন কোনো কথা নেই, তবে
পুলিসেৱ হাতে তুলে দেৱাৱ চেষ্টা হয়েছে।’

‘সেটা কী ভাবে ?’

‘পুলিসকে আমার আগুরগ্রাউন্ডেন জানিয়ে দিয়ে। আপাতত
সেইজন্তুই আমাকে ঘূর পথের ঠিকানায়, আবার দেশে ফিরে যেতে
হবে।’

‘কিন্তু বিরোধটা কিসের ?’

‘পথের। মতেরও কিছুটা বলতে পারো।’

‘যথা ?’

‘আমাদের আসল তত্ত্ব থেকে বিচ্ছেদের কথাটা কেউ কেউ মানতে
চাইছে না। অথচ, শহরের ট্রেড ইউনিয়ন, যাকে আমরা বলেছি, লেবর
অ্যারিস্টেক্যাসি, দরকষাকূমির আন্দোলন, যার সঙ্গে বিপ্লব
বিদ্রোহের কোনো যোগাযোগই নেই, এসব ছেড়ে আমরা গ্রামে চলে
গেছলাম। আজকের অর্থিক যন্ত্রেরই একটা অংশ, সে তার উৎপন্ন বস্তু
হাতে করে দাঁটে না, তার কোনো মাথা বাথাও নেই। বলতে পারো
সে এই যন্ত্রযুগের একটি উপযন্ত্র। মধ্যবিত্ত বিপ্লবীদের মিথ্যা বেড়াজাল
থেকে এরা বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু গ্রামের কেবল ভূমিহীন
কৃষক না, একজন দরিদ্র ভিক্ষুকও মাটি দাঁটিতে ভালোবাসে। বঞ্চিত
হয়েও একজন কৃষক তার ফসানো ফসল হাতে তুলে গন্ধ শোকে আর
ক্ষুধায় হাহাকার করে। তারা কোনোকালেই নিতান্ত চাষের হাল
বলদ লাঙ্গল হতে পারবে না, তাদের ফসানো ফসলের সঙ্গে সম্পর্ক
গভীর, অনেক বেশি মাটির প্রতি টান, অথচ সে সব সময় নিজের হাতে
ফসানো ফসল থেকে বঞ্চিত। সেইজন্তুই আমাদের পার্টি গোড়া থেকেই
গ্রামকে বেছে নিয়েছিল, শহরকে নয়। কিন্তু কৌ রেজাণ্ট হলো, বল।’
কমলের দাঢ়ি গোফের ভাঁজে ব্যর্থ হাসির বিষণ্ণতা।

ফুল্লরা বললো, ‘তোমাদের মতো আমাকে গ্রামে গিয়ে কৃষক দেখতে
হয়নি বটে, কিন্তু তোমার কথা শুনে, তাদের যেন আমি নতুন করে
দেখছি। রেজাণ্ট কৌ হলো, আমাকে বল।’

‘সে তো তুমি কাগজেও নিশ্চয় পড়েছ।’ কমল বললো, ‘সঠিক

ভাবে বলতে গেলে, আমাদের কোনো প্রস্তুতিই ছিল না, অথচ তার জগত
আমরা অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলাম না। আমাদের সেই ধৈর্য
কেখায় ছিল † আমরা কেবল ঝাপিয়ে পড়তেই চেয়েছিলাম। বুঝতে
পারিনি, সেই থেকেই মূল তত্ত্ব থেকে আমাদের বিচ্ছেদ শুরু হয়েছিল।
কৃষকদের যৌথ চেতনাকে আমরা জাগাতে পারিনি, আর এটা ও বুঝতে
পারিনি, দল বিপ্লবকরে না, বিপ্লব ঘটায় জনতা। ফলে অতিবিপ্লব-
বাদের কল্নাবিলাস আমাদের পেয়ে বসলো, আমরা রোমান্টিকতার
নামে হয়ে উঠলাম হৃদয়হীন। পুলিসের কাছে না, নিজেদের বরু
শ্রেণীর প্রতিই আমরা এমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠলাম, আমাদের ডগম। এত
বড় হয়ে উঠলো, আমরা জোর করে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে চাইলাম।
তার ফলেই আমাদের গ্রাম ছাড়তে হয়েছে। আসলে গ্রাম আমাদের
ছাড়ানো হয়েছে। অথচ শহরে এসে আমরা একটা মন্ত্রাকে মারতে
পারিনি, পুলিসের আইজি বা কোনো কমিশনারকেও না। এমন
কি কোনো ছদ্মবেশী নিখুঁত শক্ত শয়ঙ্গানকেও না। মাঝখান থেকে
শাসকদলের কতগুলো গুণ মস্তান এখন আমাদেরই দল ভাঁজিয়ে
খাচ্ছে, আমাদেরই মারছে, পুলিসের অনুচর ছাড়া তারা কিছুই নয়।’
ও চূপ করলো, তাকালো আশেপাশে।

ফুলরার দৃষ্টি কোনো দিকেই নেই। ইতিমধ্যে বাইরে রোদ
পশ্চিমে ঢল খেয়ে গিয়েছে। বাতাসের বেগ বেড়েছে, ওর ঢল ঝাপটা
খেয়ে গালে পড়ছে। বললো, ‘তারপর? আমাকে বলো, আমার
শুনতে ইচ্ছে করছে?’

‘আর কৌ বলবো বলো?’ কমল হাসলো, ‘জীবনকে তুচ্ছ করতে
পারি, কিন্তু কার্যকারণের কোনো কিছুই জিজ্ঞাসার অভীত হতে
পারে না। আমরা যদি স্বশৃঙ্খল সেনাবাহিনীও গঠন করি, তবে তা
বুর্জোয়াদের বিবেকহীন সামরিকবাহিনী হবে না। আমাদের অনেকের
মনেই অশ্ব জেগেছে, জাগেনি শুধু তাদের, যারা কেবল তত্ত্ব থেকে না,
জীবন আর জগৎ থেকেই যার আত্মবিচ্ছেদ ঘটে গেছে। অশ্ব জেগে-

ছিল বলেই, আমি তু মাস কলকাতায় শুধু পড়াশোনা করেছি। তার ফল হয়েছে এই, আমার মতামত আরও শক্ত হয়েছে, কিন্তু আমাদের পথ ভুল হয়েছে। ভুল কোথায়, সেটা আলোচনার বিষয়। আমরা নিজেরাই তা ঠিক করবো। তবে বিপ্লবী সরকার নয়। শোকায়ন রাষ্ট্র চাই। পৃথিবীতে নিরাজসমাজবাদীরাই তার রূপরেখা ঠিক করে দিয়ে গেছেন। বিশ্বভাতৃত্ব আর সাম্যের চিন্তা তাঁরাই প্রথম করেছিলেন। আমি পেছন ফিরে তাকাবার কথা বলছি না। কিন্তু গোড়া থেকে ভাবাই ঠিক। ‘বেজ্ঞানিক মার্কিসবাদকে জানতে হলেও, তার গোড়াও জানা দরকার।’

ফুল্লরা বললো, ‘আমি এই নিরাজসমাজবাদের কথা তোমার কাছেই প্রথম শুনছি।’

‘অর্থ সাম্যের প্রাচীনতম স্বপ্ন এই দেখেছিলেন।’ কমল বললো, ‘কনফুসিয়াসের মন্ত্র ছিল শাসক আর মেতাদের মেনে নাও। কিন্তু তাঁরই সমসাময়িক লাওৎসেকে প্রকৃতিবাদী বললেও, আমি তাঁকে নিরাজ সমাজবাদীই বলবো, যা আমাদের শেষ লক্ষ। লাওৎসে তাঁর কথা কবিতায় বা ছড়া কেটে বলতেন। যেমন একটা তোমাকে শোনাই, “যতই বিধিনির্বেধ বাড়বে, ততোই মামুষ হবে গরীব / যতো ধারালো হাতিয়ার বানাবে / রাঙ্গে ততো বাড়বে বিশৃঙ্খলা / যতো কলাকৌশল কান্দবে / ততো বেরোবে তাকে এড়াবার ফলি / যে দেশে যতো আইনকানুন / সে-দেশে ততো চোর-ডাকাতের মেলা।” যাশু জগ্নের অন্তত হ’শো বছর আগে এসব কথা বলা হয়েছে।’

ফুল্লরা অবাক মুঠস্বরে বলে উঠলো, ‘আশ্চর্য, ঠিক যেন বর্তমানের কোনো হৃদয়বান দূরদর্শী কবির কবিতার মতো শোনাচ্ছে।’

‘পুরীতে চলো, সমুদ্রের ধারে বসে তোমাকে এরকম অনেক আশ্চর্য কবিতা শোনাবো।’ কমল হাসলো।

ফুল্লরা রীতিমতো উচ্ছিসিত হয়ে উঠলো, ‘আহ, এবারের পুরী যাওয়াটা আমার সার্থক। কিন্তু একটা কথা খুব জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে।’

‘কৌ ?’

‘ছ’মাস যে কলকাতায় ছিলে, তোমার সঙ্গে তোমাদের বাড়ির
কোনো ঘোগাযোগ হয়েনি ?’

কমল আশেপাশে একবার দেখে বললো, ‘ঘোগাযোগ হয়েছিল,
কিন্তু বাড়ি যাইনি। সেখানে সবসময় নজর রাখা হয়। বাবা মা’র
সঙ্গে আলাদা এক জায়গায় দেখা হয়েছিল।’

ফুল্লরা ব্যগ্র ব্যাকুল ঘরে জিজেস করলো, ‘কৌ বললেন তাঁরা ?’

‘কৌ আর বলবেন ? ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরতে বললেন।’
কমল হাসলো, ‘আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও বাবার আছে।’

‘গেলে না ?’

‘কেন যাবো, কেমন করে যাবো ? ঘরে ফেরার জন্য তো আমি
বেরোইনি।’

‘কিন্তু আমি জানি, অনেকে ঘরে ফিরেছে।’

‘আমি তাদের দলে নেই।’ কমলের মুখে হাসি কিন্তু শক্ত
অভিব্যক্তি, ‘বাবা মা আবশ্যিক বলেছিলেন, ইউ. কে. বা স্টেটস্-এ
কোথাও চলে যেতে। ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এমন কি বিয়ের
কথাও বলেছিলেন। একেবারে নিশ্চিন্ত মুখের জীবন, কৌ বলো ?’

ফুল্লরা কিছু বললো না, বরং ওর চোখে মুখে যেন একটা স্পন্দন
মুগ্ধতা। কমল জিজেস করলো, ‘কৌ হলো ?’

ফুল্লরা যেন চমকিয়ে উঠে বললো, ‘না। মানে, তাঁরা মন্দই বা কৌ
বলেছেন। অনেক তো হলো, একটু না হয় নতুন করে দেখতে ?’

‘অনেক আবার কৌ হলো ?’ কমল অবাক হেসে বললো, ‘হয়েনি
তো কিছুই। নতুন করে দেখার জায়গা তো আমাদের একটাই।
স্থান থেকে আমি কোথাও যেতে পারি না।’

ফুল্লরা যেন ঘুমঘোরের বিশয়ে, কমলের চোখের কালো ঠলির
দিকে তাকিয়ে রইলো।

আর্টারো ॥

‘তোমার মুখে লাল আভা পড়েছে ।’ কমল বললো ।

ফুলবা অবাক হলো, বাইবে তাকালো, হেসে বললো, ‘বিকেলের আলো । তোমার মুখেও পড়েছে ।’

জঙ্গনের কথার মাঝখানেই, বাসের ভিতরে একটা ব্যস্ততা দেখা দিল । কয়েকজনের মুখে উচ্চারিত হতে শোনা গেল, ‘ভুবনেশ্বর এসে গেছে ।’

কমল ফুলবাব দিকে ঝুঁকে, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো । দূরে আকাশের গায়ে একটি মন্দির চূড়া, আর শহরের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে । যাদ্বাদের ব্যস্ত আব মাল তোলা-পাড়া করতে দেখে খোঝা গেল, কেউ কেউ ভুবনেশ্বরেই নামবে ।

‘মনে হয়, পুরী পৌছতে সঙ্ক্ষে হয়ে যাবে ।’ ফুলবা বললো ।

কমল তৎক্ষণাত কোনো জবাব দিল না । কয়েক মুহূর্ত পরে, ভুবনেশ্বর শহরের চেহারা যতো স্পষ্ট হয়ে উঠলো, ও হঠাতে ক্রত বললো, ‘আমি ভুবনেশ্বরেই নেমে যাই । কিছুই বলা যায় না, পুরীতে হয়তো জাল পাতা আছে । অবিশ্বিত থাকবেই, এমন কোনো কথা নেই । তবু সাবধানের মার নেই । কাল সকালের কোনো বাসে পুরী চলে যাবো, সমুদ্রের ধারে দেখা হবে ।’

ফুলবা অবাক হয়ে বললো, ‘হঠাতে একেবারে ডিসিশন নিয়ে নিলে ?’

‘হ্যা ।’ কমল নিচু হয়ে ওর বালিশের খোলের মতো লম্বা ব্যাগটার ভিতরে হাত দিয়ে চেপে, চেন টেনে বক্ষ করে দিল ।

କଣ୍ଠର ତଥନ ସଂଟା ବାଜିଯେ ଚିକାର କରଛେ, ‘ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମେ ଗେଛେ ।’

ଗାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଦୀଙ୍ଗାଲୋ । କମଳ ବାଇବେର ଦିକେ ଦେଖିଲୋ । ଫୁଲରାବ ଦୃଷ୍ଟି କମଳେର ଦିକେ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯାତ୍ରୀରା ନାମତେ ଆରଣ୍ୟ କରେଛେ । କମଳ ବ୍ୟାଗଟା କାହିଁ ଝୁଲୁସେ ଉଠେ ଦୀଙ୍ଗାଲୋ । କୁମାର ଆର ଅନୁର ଦିକେ ଫବେ ହାସିଲୋ, ଏଲଗୋ, ‘ଚଳି ।’

ଫୁଲରା ଘାଟିଆ କମଳେର ପାଞ୍ଚା ବ ଟେନେ ଧବିଲୋ । କମଳ ଫିରେ ଥାକାଲୋ । ଫୁଲରା ମୁଖ ‘କୁଶ୍ଲା’, ଚୋଥେବ ଇଶାରାଯ ବାଇବେର ଦିକେ ଦେଖିଲୋ । ଦେକେଣ୍ଟେ ମଧ୍ୟେଟେ, ଦେଖା ଗେଲ, ବାସେର ଦୁଇ ଦରଜାଯ, ସଞ୍ଚାର ପୁଲିସ, ରିଭଲବାର ହାତେ ଛଜନ ଅଫିସାର । ଅନ୍ୟେକଟି ଯାତ୍ରୀର ମୁଖେ ଦିକେ, ପା ଥିକେ ମାଥା ପର୍ଯ୍ୟ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଚୋଥେ ଖୁଟିଯେ ଦେଖିଛେ । କଣ୍ଠର ଆର ସହିସ ଆଗେଇ ମେମେ ଗଯିଛେ । ଏକଜନ ସଞ୍ଚାର ପୁଲିସ ଡ୍ରାଇଭାରକେ ନେମେ ଯେତେ ବଲିଲୋ । ଡ୍ରାଇଭାବ ନେମେ ଗେଲ । ଯାତ୍ରୀଦେର ଚୋଥେ ମୁଖେ ଏକଟା ସନ୍ଦେହ ଆବ ଭଯେଇ ଛାପା । ତାରା ପୁଲମ ଏବଂ ପରମ୍ପରକେ ଦେଖିଛେ ।

କମଳ ଆପେ ଆପେ ବମେ ପଡ଼ିଲୋ । ଓର ହାତ ଏଥନ ବା ଦିକେ ପାଞ୍ଚାବିର ନିଚେ । ଫୁଲରାର ସଙ୍ଗେ ଚାକିତେ ଏକବାର କୁମାର ଆର ଅନୁର ଉଂକଟିତ ଦୃଷ୍ଟିବିନିମୟ ହଲୋ । ଇତିରଥେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯାତ୍ରୀରା ସବାଇ ନେମେ ଗଯିଛେ । ଛଜନ ସଞ୍ଚାର ପୁଲମକେ ନିଯେ, ରିଭଲବାର ହାତେ ଏକଜନ ଅଫିସାର ସାମନେର ଦରଜା ଦିଯେ ବାସେର ଭିତବେ ଚକଲୋ । ବୁଟେର ଶକ୍ତି ବାସେର ପିଛନେର ଦରଜାଯାଇ । ଫୁଲରା ପିଛନ ଫିରେ ଦେଖିଲୋ, ଏକଇ ସଙ୍ଗେ ପିଛନ ଦିକେଓ ସଞ୍ଚାର ପୁଲିସ ଆର ଅଫିସର ଉଠେ ଏମେହେ ।

ଫୁଲରା ଦରଦର କରେ ସାମଛେ, ବୁକେ ଦାଦାମା ବାଜିଛେ । ପୁଲିସ ଛ ଦିକ୍ ଥିକେ ଓଦେର ସାମନେ ପିଛନେ ଏମେ ଦୀଙ୍ଗାଲୋ । କମଳେର କାଳୋ ଠୁଲି ପରା ମୁଣ୍ଡି ପାଥରେର ।

‘କମଳବାବୁ । ଉଠନ ।’ ଠିକ ପିଛନେର ସୌଟ ଥିକେଇ, ମେଇ ସମାଲୋଚକ ସମସ୍ତଦେର ଏକଜନ ବଲେ ଉଠିଲୋ ।

ଫୁଲରାର ବୁକେ ଯେନ ଛୁରି ବିଂଧେ ଗେଲ । ଲୋକ ଛଟୋଇ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ?

কলকাতা থেকেই অনুসরণ করছে। কমল পিছন ফিরে দেখলো, কিছু বললো না। সামনের অফিসার রিভলভার তুলে, পরিষ্কার বাংলায় বললো, ‘নেমে আসুন।’

কমল উঠে দাঢ়ালো। কাবোব দিকে তাকালো না। এমন কি ফুল্লরাব দিকেও না। ফুল্লরা কিছু বলে উঠতে যাচ্ছিল, কুমার ডেকে উঠলো, ‘ফুলু, তুমি এদিকে চলে এসো।’

কমল সামনের দরজার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল। ওর বাঁহাত এখন পাঞ্জাবির বাইরে ঝুলচে। ডান কাঁধে ব্যাগ। ফুল্লরা কুমারের কথা শুনতে পেলো, কিন্তু কমলের টিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। পিছনের আসনের লোক ছটেও উঠলো। সমস্ত বাস স্থৰ।

ফুল্লরা দেখচে, কমল বাস থেকে নামলো। ফুল্লরার ঠোট কাপচে, কথা বলতে পারছে না, গলার কাছে যেন শক্ত কিছু টেকে আছে। টিক এষ মুহূর্তেই চকিতে ঘটনাটা ঘটলো। কমল ওর কাঁধের ব্যাগটা চোখের পলকে অফিসাবের রিভলভার ধরা হাতের উপর ছুঁড়ে মাবলো। শুধু অফিসারের রিভলভারটা পড়ে গেল না, লোকটা বেশ খানিকটা দূরে ছিটকে সরে গেল। একজন সশস্ত্র পুলিস কাছে থেকে রাইফেল বাগাবার আগেই, কমলের হাতে রিভলভার ঝলকিয়ে উঠলো। একটা গুলি ছুঁড়েই লাফ দিয়ে, বাসের ডানদিকে মোড় নিয়ে ছুটলো। স্পষ্টতই কমল কারোকে মারবার জন্ম গুলি ছোড়েন। একটা চমক লাগিয়ে, পরিষ্কার শব্দে উলটপালট করে দিয়ে, পালানোটাই যেন ওর উদ্দেশ্য ছিল।

ফুল্লরা সব কিছু ভুলে গিয়ে, ডান দিকের জানালায় বাঁপিয়ে পড়লো। বাইরে তখন পুলিসের চিংকার। বুটের ছুটোছুটির শব্দ। ফুল্লরা দেখতে পেল, কমল বাসের পিছন দিকে দৌড়েচ্ছে। হঠাৎ পর পর কয়েকটা গুলির শব্দ, ফুল্লরা চিংকার করে উঠলো, ‘না না...’

কমল তখন রাস্তার মাঝখানে উপুড় হয়ে পড়েছে। ওর সামনে একটা গর্জমান জীপ। চারপাশে সশস্ত্র পুলিসের বেষ্টনীতে কমলকে

ଆର ଦେଖୁ ଯାଚେ ନା । ଫୁଲରାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗେଲ ବାସେର ଗନାଳାଯା, ଓ ଏକବାର ଚିକାର କରତେ ଗେଲ । ଅମୁ ଓକେ ନିଜେର ବୁକ୍ ଟେମେ ନିଲ ।

ଆବାର ଏକଦମ ସଶତ୍ରୁ ପୁଲିମ ଛୁଟେ ଏସେ ବାସେର ମଧ୍ୟେ ଚୁକହେ, । ଏକ ଦରଜା ଦିଯେ ଛୁକେ, ଆର ଏକ ଦରଜା ଦିଯେ ନେମେ ଯାବାର ଆଗେ, ମକଳେର ମୁଖେର ଦିକେ ଦେଖିଲୋ । ଆଫିସାର ଏକବାର ଅନୁଦେର ଆସନେ ସାମନେ ଦୀଢ଼ାଲୋ, ଦେଖିଲୋ ଫୁଲରାକେ, ବଲଲୋ, ‘ଶକ୍ତି ?’ କୋନୋ ଝବାବେର ଅଭ୍ୟାସା ନା କରେଇ ନେମେ ଗେଲ ।

ଡାଇଭାର ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେ ଏଞ୍ଜିନ ସ୍ଟାର୍ଟ ଦିଲ । କଣ୍ଟାଟିର ଆର ସହିମ ଉଠେ ଛୁଦିକ ଥେକେ ଦରଜା ବନ୍ଧ କରିଲୋ । ବାଇରେ ଥେକେ ହୃଦୟ ଶୋନା ଗେଲ, ‘ଛୋଡ଼ ।’

ବାସ ଗର୍ଜନ କରେ ଛୁଟିଲୋ । ଭିତରେ ତଥିନୋ ଶ୍ଵରାଣୀ । କେବଳ କଣ୍ଟାଟିବେର ଗଲା ଶୋନା ଗେଲ, ‘ଏକଦମ ଝାଙ୍ଗରା କବେ ଦିଯେଇଛେ ।’ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଫୁଲରାର ଦିକେ ।

ଫୁଲରାର କାନେ ବାଜିଛେ, ‘ସମୁଦ୍ରର ଧାରେ ଦେଖା ହବେ । ସମୁଦ୍ରର ଧାରେ…… ।’

‘ଫୁଲୁ ।’ କୁମାର ଡାକିଲୋ ।

ଫୁଲରା ଉଠେ ଦୀଢ଼ାଲୋ । ମକଳେର ଦୃଷ୍ଟି ଏଥନ ଓର ଦିକେ । ପିଛନେର ଆସନେ ସେଇ ଲୋକ ଛଟୋ ନେଇ । ଫୁଲରା ଝାଂଚିଲ ଦିଯେ ଚୋଥ ମୁଖ ମୁହଲୋ । ନା, ଓ କୌଦତେ ପାରଛେ ନା । ଓ ତେରୋ ନସ୍ବର ଆସନେ ଗିଯେ ବମଲୋ । ବାଇରେ ଦିକେ ତାକିଯେ ଓ ଶହର ଦେଖିଛେ ନା । ଓ ଦେଖିଛେ, ସମୁଦ୍ରର ଧାର ଦିଯେ କମଳ ହିଁଟେ ଚଲେଇଁ, ଉଜ୍ଜଳ ଚୋଥେ ହାସିର ହାତି । ହାଜାର ହାଜାର ଶହର ଆଗେର ନିରାଜବାଦୀ ସମାଜେର କବିତା ବଲଛେ, ଆର ହାସଛେ ଖଣି ଶୋନୋ ଯାଚେ, ବାଣୀ ବୋବା ଯାଚେ ନା ।

ସମୁଦ୍ର ଅଚନ୍ଦ ହୁଁ ତୀରେ ଆହିଡେ ପଡ଼ିଛେ, ଆର ଫେନପୁଞ୍ଜ ହାସିତେ ଧଳଖଳ କରିଛେ ।